আল হাজ্জ

২২

নামকরণ

চতুর্থ রুকূ'র দ্বিতীয় আয়াত وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরায় মক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট মিলেমিশে আছে। এ কারণে মুফাস্সিরগণের মাঝে এর মক্কী বা মাদানী হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমার মতে এর একটি অংশ মক্কী যুগের শেষের দিকে এবং অন্য অংশটি মাদানী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হবার কারণে এর বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীতে এ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এজন্য উভয় যুগের বৈশিষ্ট এর মধ্যে একক হয়ে গেছে।

গোড়ার দিকের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে বেশী নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এ অংশটি মক্কী জীবনের শেষ যুগে হিজরতের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ অংশটি ২৪ আয়াত وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ-এ এসে শেষ হয়ে গেছে।

এরপর اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে হঠাৎ বিষয়বস্তুর প্রকৃতি পাল্টে গেছে এবং পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্তকার অংশটি মদীনা তাইয়েবায় নাযিল হয়েছে। এ অংশটি যে, হিজরতের পর প্রথম বছরেই যিলহজ্জ মাসে নাযিল হয়েছে তা মনে করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ২৫ থেকে ৪১ আয়াত পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে তা একথাই নির্দেশ করে এবং ৩৯-৪০ আয়াতের শানেনুযুল তথা নাযিলের কার্যকারণও এর প্রতি সমর্থন দেয়। সে সময় মুহাজিররা সবেমাত্র নিজেদের জন্মভূমি ও বাড়িঘর ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন। হজ্জের সময় তাদের নিজেদের শহর ও হজ্জের সমাবেশের কথা মনে পড়ে থাকতে পারে। কুরাইশ মুশরিকরা যে তাদের মসজিদে হারামে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে একথা তাদের মনকে মারাত্মকভাবে তোলপাড় করে থাকবে। যে অত্যাচারী কুরাইশ গোষ্ঠী ইতিপূর্বে তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, মসজিদে হারামের যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করার জন্য তাদের জীবন পর্যন্ত দুর্বিসহ করে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হয়তো যুদ্ধ করারও অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ ছিল এ আয়াতগুলোর নাযিলের যথার্থ মনস্তাত্বিক পটভূমি। এখানে প্রথমে হজ্জের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য মসজিদে হারাম নির্মাণ এবং হজ্জের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ সেখানে

শিরক করা হচ্ছে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য তার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরপর এ দুরাচারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং এদেরকে বেদখল করে দেশে এমন একটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যেখানে অসৎবৃত্তি প্রদমিত ও সৎবৃত্তি বিকশিত হবে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, কাতাদাহ ও অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত। অন্যদিকে হাদীস ও সীরাতের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রমাণ হয়, এ অনুমতির পরপরই করাইশদের বিরুদ্ধে বাস্তব কর্মতৎপরতা শুরু করা হয় এবং দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে লোহিত সাগরের দিকে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয়। এটি দাওয়ান যুদ্ধ বা আবওয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

এ সূরায় তিনটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ মক্কার মুশরিক সমাজ, দ্বিধাগ্রস্ত ও দোটানায় পড়ে থাকা মুসলিমগণ এবং আপোষহীন সত্যনিষ্ঠ মু'মিন সমাজ।

মুশরিকদেরকে সম্বোধন করার পর্বটি মক্কায় শুরু হয়েছে এবং মদীনায় এর সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ সম্বোধনের মাধ্যমে তাদেরকে বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ভিত্তিহীন জাহেলী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব মাবুদদের ওপর ভরসা করেছো যাদের কাছে কোনো শক্তি নেই এবং আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমাদের পূর্বে এ নীতি অবলম্বনকারীরা যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তোমাদেরও অনিবার্যভাবে সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। নবীকে অমান্য করে এবং নিজের জাতির সবচেয়ে সৎলোকদেরকে জুলুম নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছো। এর ফলে তোমাদের ওপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে তা থেকে তোমাদের বানোয়াট উপাস্যরা তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। এ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে বুঝাবার ও উপলব্ধি করাবার কাজও চলছে। সমগ্র সূরার বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়া ও উপদেশ প্রদানের কাজও চলেছে। এ সংগে শিরকের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদ ও আখেরাতের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণও পেশ করা হয়েছে।

দ্বিধান্বিত মুসলমানরা, যারা আল্লাহর বন্দেগী গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর পথে কোনো প্রকার বিপদের মুকাবিলা করতে রাজি ছিল না, তাদেরকে সম্বোধন করে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা ও ধমক দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এটা কেমন ঈমান ! আরাম, আয়েশ, আনন্দ ও সুখ লাভ হলে তখন আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ থাকে এবং তোমরা তাঁর বান্দা থাকো, কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে বিপদ আসে এবং কঠিন সংকটের মুকাবিলা করতে হয় তখনই আল্লাহ আর তোমাদের আল্লাহ থাকে না এবং তোমরাও তাঁর বান্দা থাকো না। অথচ নিজেদের এ নীতি ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তোমরা এমন কোনো বিপদ, ক্ষতি ও কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবে না, যা আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন।

ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করা হয়েছে দু'টি পদ্ধতিতে। একটি ভাষণে সম্বোধন এমনভাবে করা হয়েছে যার লক্ষ তারা নিজেরাও এবং এ সংগে আরবের সাধারণ জনসমাজও। আর দ্বিতীয় ভাষণটির লক্ষ কেবলমাত্র মু'মিনগণ।

প্রথম ভাষণে মক্কার মুশরিকদের মনোভাব ও কর্মনীতির সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা মুসলমানদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কাজেই কাউকে হজ্জ করার পথে বাধা দেবার অধিকার তাদের নেই। এ আপত্তি শুধু যে, যথার্থই ছিল তাই নয় বরং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটি কুরাইশদের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তম অস্ত্রও ছিল। এর মাধ্যমে আরবের অন্যান্য সকল গোত্রের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যে, কুরাইশরা হারাম শরীফের খাদেম, না মালিক ? আজ যদি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একটি দলকে হজ্জ করতে বাধা দেয় এবং তাদের এ পদক্ষেপকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে কালকেই যে, তারা যার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে তাকে হারাম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দেবে না এবং তার উমরাহ ও হজ্জ বন্ধ করে দেবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? এ প্রসংগে মসজিদুল হারামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একদিকে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর হুকুমে এ ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন তখন সবাইকে এ ঘরে হজ্জ করার সাধারণ অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রথম দিন থেকেই সেখানে স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বলা হয়েছে, এ ঘরটি শিরক করার জন্য নয় বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। অথচ কী ভয়ংকর কথা ! আজ সেখানে এক আল্লাহর বন্দেগী নিষিদ্ধ কিন্তু মূর্তি ও দেবদেবীর পূজার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

দ্বিতীয় ভাষণে মুসলমানদেরকে কুরাইশদের জুলুমের জবাবে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সংগে মুসলমানরা যখন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করবে তখন তাদের নীতি কি হবে এবং নিজেদের রাষ্ট্রে তাদের কি উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে একথাও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি সূরার মাঝখানে আছে এবং শেষেও আছে। শেষে ঈমানদারদের দলের জন্য "মুসলিম" নামটির যথারীতি ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, তোমরাই হচ্ছো ইবরাহীমের আসল স্থলাভিষিক্ত। তোমরা দুনিয়ায় মানব জাতির সামনে সাক্ষদানকারীর স্থানে দাঁড়িয়ে আছো, এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের নামায কায়েম, যাকাত দান ও সৎকাজ করে নিজেদের জীবনকে সর্বোত্তম আদর্শ জীবনে পরিণত করা এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো উচিত।

এ সুযোগে সূরা বাকারাহ ও সূরা আনফালের ভূমিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়। এতে আলোচ্য বিষয় অনুধাবন করা বেশী সহজ হবে।

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

হে মানবজাতি! তোমাদের রবের গযব থেকে বাঁচো। আসলে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই (ভয়ংকর) জিনিস।[১] যেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক দুধদানকারিনী নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে,[২] প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমনি কঠিন।[৩]

১. এ প্রকম্পন হবে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার প্রকাশ। আর সম্ভবত এটা এমন সময় শুরু হবে যখন যমীন অকস্মাত উল্টে পড়তে শুরু করবে এবং সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। একথাই বর্ণনা করেছেন প্রাচীন তাফসীরকারদের মধ্য থেকে আলকামাহ ও শা'বী। তারা বলেছেন ঃ يكون ذلك عند طلوع الشمس من مغربها ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা থেকে একথাটিই জানা যায়। সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এক ফুঁক হবে "ফাযা" তথা ভীতি উৎপাদনকারী, দ্বিতীয় ফুঁক "সা'আক" তথা সংজ্ঞা লোপকারী বিকট গর্জন এবং তৃতীয় ফুঁক হবে "কিয়াম লি-রব্বিল আলামীন" অর্থাৎ রব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হবার ফুঁক। প্রথম ফুঁকটি সাধারণ বিভীষিকার সৃষ্টি করবে এবং মানুষ হতভম্ভ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই মরে পড়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁকের পর সবাই জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। তারপর প্রথম ফুঁকের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, সে সময় পৃথিবীর অবস্থা হবে এমন একটি নৌকার মতো যা ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছে অথবা এমন ঝুলন্ত প্রদীপের মতো

যা বাতাসের ঝটকায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে বসতকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। যেমন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

"যখন সিংগায় এক ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙে দেয়া হবে তখন সে বিরাট ঘটনাটি ঘটে যাবে।" (আল হা-ক্কাহ ১৩-১৫)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ○

"যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো ?" (আয যিলযাল ১-৩)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ○ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ○ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ○ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ○

"যেদিন প্রকম্পনের একটি ঝট্‌কা একেবারে নাড়িয়ে দেবে এবং এরপর আসবে দ্বিতীয় ঝট্‌কা। সেদিন অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হবে।" (আন নাযিআত ৬-৯)

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ○ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ○

"যে দিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুড়ো গুড়ো হয়ে ধূলির মতো উড়তে থাকবে।" (আল ওয়াকিআহ, আয়াত ৪-৬)

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا ○ نِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ○

"যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদেরকে বুড়ো করে দেবে এবং যার প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ?" (আল মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ১৭-১৮)

যদিও কোনো কোনো মুফাস্‌সিরের মতে এ কম্পনটি হবে এমন সময়ে যখন মৃতরা জীবিত হয়ে নিজেদের রবের সামনে হাজির হবে, এবং এর সমর্থনে তাঁরা একাধিক হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন তবুও কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা এ হাদীস গ্রহণ করার পথে বাধা। কুরআন এর যে সময় বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এমন এক সময় যখন মায়েরা শিশু সন্তানদের দুধ পান করাতে করাতে তাদেরকে ফেলে রেখে পালাতে থাকবে এবং

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ
مَّرِيْدٍ ۝٣ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى
عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝٤ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ
فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ
مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ

কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে[৪] এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। অথচ তার ভাগ্যেই তো এটা লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে বন্ধুত্ব করবে তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের আযাবের পথ দেখিয়ে দেবে। হে লোকেরা ! যদি তোমাদের মৃত্যু পরের জীবনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে,[৫] তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর গোশতের টুকরা থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতিহীনও।[৬] (এ আমি বলছি) তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশুর আকারে তোমাদের বের করে আনি, (তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও।

গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, আখেরাতের জীবনে কোনো মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাবে না এবং কোনো গর্ভবতীর গর্ভপাত হবার কোনো সুযোগও সেখানে থাকবে না। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে সবরকমের সম্পর্ক খতম হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা নিয়ে আল্লাহর সামনে হিসেব দিতে দাঁড়াবে। কাজেই আমি পূর্বেই যে হাদীস উদ্ধৃত করেছি সেটিই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। যদিও তার বর্ণনা পরম্পরা দুর্বল কিন্তু কুরআনের সমর্থন তার দুর্বলতা দূর করে দেয়। অন্যদিকে অন্যান্য হাদীসগুলো বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে বেশী শক্তিশালী হলেও কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনার সাথে গরমিল থাকায় এগুলোকে দুর্বল করে দেয়।

২. আয়াতে مُرْضِعٌ এর পরিবর্তে مُرْضِعَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষার দিক দিয়ে উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, مُرْضِعٌ অর্থ হচ্ছে

যে দুধ পান করায়। এবং مُرْضِعَةٌ এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন কার্যত সে দুধ পান করাতে থাকে এবং শিশু তার স্তন মুখের মধ্যে নিয়ে থাকে। কাজেই এখানে যে ছবিটি আঁকা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, যখন কিয়ামতের সে কম্পন শুরু হবে, মায়েরা নিজেদের শিশুসন্তানদেরকে দুধ পান করাতে করাতে ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি হলো, একথা কোনো মায়ের মনেও থাকবে না।

৩. একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে তাঁর গযবের কারণ হয় এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়াই উদ্দেশ্য। এজন্য কিয়ামতের এ সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনার পর সামনের দিকে আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে।

৪. সামনের দিকের ভাষণ থেকে জানা যায়, এখানে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে বিতর্কের ওপর আলোচনা করা হচ্ছে তা আল্লাহর সত্তা ও তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কিত নয় বরং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার এবং তাঁর পাঠানো শিক্ষাবলী সম্পর্কিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে তাওহীদ ও আখেরাতের স্বীকৃতি চাচ্ছিলেন। এ বিষয়েই তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করতেন। এ দু'টি বিশ্বাসের ওপর বিতর্ক শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে ঠেকতো তা এই ছিল যে, আল্লাহ কি করতে পারেন এবং কি করতে পারেন না, তাছাড়া এ বিশ্ব-জাহানের প্রভুত্বের কর্তৃত্ব কি শুধুমাত্র এক আল্লাহরই হাতে ন্যস্ত অথবা অন্য কতক সত্তারও এখানে প্রভুত্বের কর্তৃত্ব আছে ?

৫. এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ এমন একটি উপাদান থেকে তৈরি হয় যার সবটুকুই গৃহীত হয় মাটি থেকে এবং এ সৃজন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় শুক্র থেকে। অথবা মানব প্রজাতির সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালাম থেকে। তাঁকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেমন সূরা সিজদায় বলা হয়েছে ঃ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝

"মানুষের সৃষ্টি শুরু করেন মাটি থেকে তারপর তার বংশ-ধারা চালান একটি নির্যাস থেকে যা বের হয় তুচ্ছ পানির আকারে।" (আস সাজদাহ, ৭-৮ আয়াত)

৬. এখানে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে থাকে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। আজকাল শুধুমাত্র শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের বিভিন্ন স্তরের যেসব বিস্তারিত বিষয়াবলী দৃষ্টিগোচর হতে পারে সেগুলো বর্ণনা করা হয়নি। বরং সেকালের সাধারণ বদ্দুরাও যেসব বড় বড় সুস্পষ্ট পরিবর্তনের কথা জানতো সেগুলো এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুক্র গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে স্থিতি লাভ করার পর প্রথমে জমাট রক্তের একটি পিণ্ড হয়। তারপর তা একটি গোশতের টুকরায় পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় কোনো আকৃতি সৃষ্টি হয় না। এরপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে মানবিক আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। গর্ভপাতের বিভিন্ন অবস্থায় যেহেতু মানব সৃষ্টির এসব পর্যায় লোকেরা

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦ وَأَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝٧

আর তোমাদের কাউকে কাউকে তার পূর্বেই ডেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে সবকিছু জানার পর আবার কিছুই না জানে।[৭] আর তোমরা দেখছো যমীন বিশুষ্ক পড়ে আছে তারপর যখনই আমি তার ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি তখনই সে সবুজ শ্যামল হয়েছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং সব রকমের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদগত করতে শুরু করেছে। এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য,[৮] তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী। আর এই (একথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে।[৯]

প্রত্যক্ষ করতো তাই এদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এটি বুঝার জন্য সেদিন ভ্রূণতত্বের বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন ছিল না, আজো নেই।

৭. অর্থাৎ এমন বৃদ্ধাবস্থা যখন মানুষের নিজের শরীরের ও অংগ-প্রত্যংগের কোনো খোঁজ-খবর থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে জ্ঞান দিতো বুড়ো হয়ে সে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাকে শিশুদের অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। যে জ্ঞান জানা শোনা, অভিজ্ঞতা ও দুরদর্শিতা ছিল তার গর্বের বস্তু তা এমনই অজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, একটি ছোট ছেলেও তার কথায় হাসতে থাকে।

৮. এ ধারাবাহিক বক্তব্যের মধ্যে এ বাক্যাংশটির তিনটি অর্থ হয়। এক, আল্লাহই সত্য এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের কোনো সম্ভাবনা নেই,—তোমাদের এ ধারণা ডাহা মিথ্যা। দুই, আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক নয়। কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা দূর করার জন্য এ ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি নিছক দার্শনিকদের চিন্তার আবিষ্কার অনিবার্য সত্তা ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই (First cause) নয় বরং তিনি প্রকৃত

স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিন, তিনি কোনো খেলোয়াড় নন যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য খেলনা তৈরী করেন এবং তারপর অযথা তা ভেঙে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বরং তিনি সত্য, তাঁর যাবতীয় কাজ গুরুত্বপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক ও বিজ্ঞানময়।

৯. এ আয়াতগুলোতে মানুষের জন্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মাটির ওপর বৃষ্টির প্রভাব এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকে পাঁচটি সত্য নির্ণয়ের প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সত্যগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ আল্লাহই সত্য।

দুই ঃ তিনি মৃতকে জীবিত করেন।

তিন ঃ তিনি সর্বশক্তিমান।

চার ঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবেই।

পাঁচ ঃ যারা মরে গেছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন।

এখন দেখুন এ নিদর্শনগুলো এ পাঁচটি সত্যকে কিভাবে চিহ্নিত করে।

সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার কথা বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র নিজেরই জন্মের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে জানতে পারবে যে, এক একটি মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা ও কলা-কৌশল সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেকের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়েই তাঁর স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়। একদল বলে, একটা অন্ধ, বধির এবং জ্ঞান ও সংকল্পহীন প্রকৃতি একটা ধরাবাধা আইনের ভিত্তিতে এসব কিছু চালাচ্ছে। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে যে, এক একটি মানুষ যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করে এবং তারপর যেভাবে অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, তার মধ্যে একজন অতিশয় জ্ঞানী ও একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তার ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কেমন সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ যে খাদ্য খায়, তার মধ্যে কোথাও মানবিক বীজ লুকিয়ে থাকে না এবং তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস থাকে না যা মানবিক প্রাণের বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে। এ খাদ্য শরীরে গিয়ে কোথাও চুল, কোথাও গোশত এবং কোথাও হাড়ে পরিণত হয়, আবার একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছে এই খাদ্যই এমন শুক্রে পরিণত হয়, যার মধ্যে মানুষে পরিণত হবার যোগ্যতার অধিকারী বীজ থাকে। এ বীজগুলোর সংখ্যা এত অগণিত যে, একজন পুরুষ থেকে একবারে যে শুক্র নির্গত হয় তার মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট পাওয়া যায় এবং তাদের প্রত্যেকেই স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলে মানুষের রূপ লাভ করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু একজন জ্ঞানী সর্বশক্তিমান ও একচ্ছত্র শাসকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ অসংখ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকে কোনো বিশেষ সময় ছাটাই বাছাই করে এনে স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলনের সুযোগ দেয়া হয় এবং এভাবে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া চলে। তারপর গর্ভধারণের সময় পুরুষের শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বকোষের (Egg cell) মিলনের ফলে প্রথমদিকে যে জিনিসটি তৈরি হয় তা এত ছোট হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। এ ক্ষুদ্র জিনিসটি নয় মাস ও কয়েক দিন

গর্ভাশয়ে লালিত হয়ে যে অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে একটি জ্বলজ্যান্ত মানুষের রূপ গ্রহণ করে তার মধ্য থেকে প্রতিটি স্তরের কথা চিন্তা করলে মানুষের মন নিজেই সাক্ষ দেবে যে, এখানে প্রতি মুহূর্তে একজন সদা তৎপর বিচক্ষণ জ্ঞানীর ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কাজ করে চলছে। তিনিই সিদ্ধান্ত দেন, কাকে পূর্ণতায় পৌছাবেন এবং কাকে রক্তপিণ্ডে অথবা গোশতের টুকরায় কিংবা অসম্পূর্ণ শিশুর আকারে খতম করে দেবেন। তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, কাকে জীবিত বের করবেন এবং কাকে মৃত। কাকে সাধারণ মানবিক আকার আকৃতিতে বের করে আনবেন এবং কাকে অসংখ্য অস্বাভাবিক আকারের মধ্য থেকে কোনো একটি আকার দান করবেন। কাকে পূর্ণাঙ্গ মানবিক অবয়ব দান করবেন আবার কাকে অন্ধ, বোবা, বধির বা লুলা ও পংগু বানিয়ে বের করে আনবেন। কাকে সুন্দর করবেন এবং কাকে কুৎসিত। কাকে পুরুষ করবেন এবং কাকে নারী। কাকে উচ্চ পর্যায়ের শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে পাঠাবেন এবং কাকে নির্বোধ ও বেকুফ করে সৃষ্টি করবেন। সৃজন ও আকৃতিদানের এ কাজটি প্রতিদিন কোটি কোটি নারীর গর্ভাশয়ে চলছে। এর মাঝখানে কোনো সময় কোনো পর্যায়েও এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তি সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং কোন্ পেটে কি জিনিস তৈরি হচ্ছে এবং কি তৈরি হয়ে বের হয়ে আসবে এতটুকুও কেউ বলতে পারে না। অথচ মানব সন্তানদের কমপক্ষে শতকারা ৯০ জনের ভাগ্যের ফায়সালা এই স্তরগুলোতেই হয়ে যায় এবং এখানেই কেবল ব্যক্তিদেরই নয় জাতিসমূহেরও এমনকি সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যতের ভাঙাগড়া সম্পন্ন হয়। এরপর যেসব শিশু দুনিয়ায় আসে তাদের কাকে প্রথম শ্বাস নেবার পরই মরে যেতে হবে। কাকে বড় হয়ে যুবক হতে হবে এবং কার যৌবনের পর বার্ধক্যের পাট চুকাতে হবে? তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কে এ সিদ্ধান্ত নেয় ? এখানেও একটি প্রবল ইচ্ছা কার্যকর দেখা যায়। গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে অনভুব করা যাবে তাঁর কর্মতৎপরতা কোন্ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং এরি ভিত্তিতে তিনি কেবল ব্যক্তিদেরই নয়, জাতির ও দেশের ভাগ্যেরও ফায়সালা করছেন। এসব কিছু দেখার পরও যদি আল্লাহ "সত্য" এবং একমাত্র আল্লাহই "সত্য" এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে তাহলে নিসন্দেহে সে বুদ্ধিভ্রষ্ট।

দ্বিতীয় যে কথাটি এ নিদর্শনগুলো থেকে প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন" আল্লাহ কখনো মৃতদেরকে জীবিত করবেন, একথা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যায়। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে তিনি তো প্রতি মুহূর্তে মৃতকে জীবিত করছেন। যেসব উপাদান থেকে মানুষের শরীর গঠিত হয়েছে এবং যেসব খাদ্যে সে প্রতিপালিত হচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে কয়লা, লোহা, চূন, কিছু লবণজাত উপাদান ও কিছু বায়ু এবং এ ধরনের আরো কিছু জিনিস। এর মধ্যে কোনো জিনিসেও জীবন ও মানবাত্মার বৈশিষ্টের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এসব মৃত নির্জিব উপাদানগুলোই একত্র করে তাকে একটি জীবিত ও প্রাণময় অস্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। তারপর এসব উপাদান সম্বলিত খাদ্য মানুষের দেহে পরিবেশিত হয় এবং সেখানে এর সাহায্যে পুরুষের মধ্যে এমন শুক্রকীট এবং নারীর মধ্যে এমন ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয় যাদের মিলনের ফলে প্রতিদিন জীবন্ত ও প্রাণময় মানুষ তৈরি হয়ে বের হয়ে

আসছে। এরপর নিজের আশপাশের মাটির ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন। পাখি ও বায়ু অসংখ্য জিনিসের বীজ চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছিল এবং অসংখ্য জিনিসের মূল এখানে সেখানে মাটির সাথে মিশে পড়েছিল। তাদের কারো মধ্যেও উদ্ভিদ জীবনের সামন্যতম লক্ষণও ছিল না। মানুষের চারপাশের বিশুষ্ক জমি এ লাখো লাখো মৃতের কবরে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যখনই এদের ওপর পড়লো পানির একটি ফোঁটা অমনি চারদিকে জেগে উঠলো জীবনের বিপুল সমারোহ। প্রত্যেকটি মৃত বৃক্ষমূল তার কবর থেকে মাথা উঁচু করলো এবং প্রত্যেকটি নিষ্প্রাণ বীজ একটি জীবন্ত চারাগাছের রূপ ধারণ করলো। এ মৃতকে জীবিত করার মহড়া প্রত্যেক বর্ষা ঋতুতে মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এ নিদর্শগুলো পর্যবেক্ষণ থেকে তৃতীয় যে জিনিসটি প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ সর্বশক্তিমান।" সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কথা বাদ দিন শুধুমাত্র আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির কথাই ধরা যাক। আর পৃথিবীরও সমস্ত তত্ব ও ঘটনাবলীর কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষ ও উদ্ভিদেরই জীবনধারা বিশ্লেষণ করা যাক। এখানে তাঁর শক্তিমত্তার যে অভাবনীয় কর্মকাণ্ড দেখা যায় সেগুলো দেখার পর কি কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলতে পারেন যে, আজ আমরা আল্লাহকে যা কিছু করতে দেখছি তিনি কেবল অতটুকুই করতে পারেন এবং কাল যদি তিনি কারো কিছু করতে চান তাহলে করতে পারবেন না ? আল্লাহ তো তবুও অনেক বড় ও উন্নত সত্তা, মানুষের সম্পর্কেও বিগত শতক পর্যন্ত লোকদের ধারণা ছিল যে, এরা শুধুমাত্র মাটির ওপর চলাচলকারী গাড়িই তৈরি করতে পারে, বাতাসে উড়ে চলা গাড়ি তৈরি করার ক্ষমতা এর নেই। কিন্তু আজকের উড়োজাহাজ-গুলো জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের "সম্ভাবনা"র সীমানা নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাদের ধারণা কত ভুল ছিল। আজ যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আজকের কাজগুলো দেখে তাঁর জন্য সম্ভাবনার কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে বলতে থাকে যে, তিনি যা কিছু করছেন এছাড়া আর কিছু করতে পারেন না, তাহলে সে শুধুমাত্র নিজেরই মনের সংকীর্ণতার প্রমাণ দেয়, আল্লাহর শক্তি তার বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে আটকে থাকতে পারে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম কথা অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আসবেই" এবং "আল্লাহ অবশ্যই মৃত লোকদেরকে জীবিত করে উঠাবেন"—একথা দু'টি উপরে আলোচিত তিনটি কথার যৌক্তিক পরিণতি। আল্লাহর কাজগুলোকে তাঁর শক্তিমত্তার দিক দিয়ে দেখলে মন সাক্ষ দেবে যে, তিনি যখনই চাইবেন সকল মৃতকে আবার জীবিত করতে পারবেন, ইতিপূর্বে যাদের অস্তিত্ব ছিল না, তাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছিলেন। আর যদি তাঁর কার্যাবলীকে তাঁর প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দেখা যায় তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষ্য দেবে যে, এ দুটি কাজও তিনি অবশ্যই করবেন। কারণ, এগুলো ছাড়া যুক্তির দাবী পূর্ণ হয় না এবং একজন প্রাজ্ঞ সত্তা এ দাবী পূর্ণ করবেন না, এটা অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ যে সীমিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করছে তার ফল আমরা দেখি যে, সে যখনই নিজের টাকা পয়সা, সম্পত্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয় তার কাছ থেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে হিসেব অবশ্যই নেয়। অর্থাৎ আমানত ও হিসেব-নিকেশের মধ্যে যেন একটি অনিবার্য যৌক্তিক সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সীমিত প্রজ্ঞাও কোনো অবস্থায় এ সম্পর্ককে উপেক্ষা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝٨ ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠

আরো কিছু লোক এমন আছে যারা কোনো জ্ঞান[১০] পথনির্দেশনা[১১] ও আলো বিকিরণকারী কিতাব[১২] ছাড়াই ঘাড় শক্ত করে[১৩] আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করা যায়।[১৪] এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আগুনের আযাবের জ্বালা আস্বাদন করাবো। এ হচ্ছে তোমার ভবিষ্যত, যা তোমার হাত তোমার জন্য তৈরি করেছে, নয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

করতে পারে না। তারপর এ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষ ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে থাকে। ইচ্ছাকৃত কাজের সাথে নৈতিক দায়িত্বের ধারণা সম্পৃক্ত করে। কাজের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করে। ভালো কাজের ফল হিসেবে প্রশংসা ও পুরস্কার পেতে চায় এবং মন্দ কাজের দরুন শাস্তি দাবী করে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে নিজেরাই একটি বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যে স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে এ প্রজ্ঞা হারিয়ে ফেলবেন একথা কি কল্পনা করা যেতে পারে ? একথা কি মেনে নেয়া যায় যে, নিজের এতবড় দুনিয়াটা এত বিপুল সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যাপক ক্ষমতা সহকারে মানুষের হাতে সোপর্দ করার পর তিনি ভুলে গেছেন এবং এর হিসেব কখনো নেবেন না ? কোনো সুস্থ বোধসম্পন্ন মানুষের বুদ্ধি কি সাক্ষ দিতে পারে যে, মানুষের যে সমস্ত খারাপ কাজ শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায় অথবা যেসব খারাপ কাজের উপযুক্ত শাস্তি তাকে দেয়া যেতে পারেনি, সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কখনো আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং যেসব ভালো কাজ তাদের ন্যায়সংগত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে সেগুলো চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাবে ? যদি এমনটি না হয়ে থাকে, তাহলে কিয়ামত ও মৃত্যু পরের জীবন জ্ঞানবান ও প্রাজ্ঞ আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি অনিবার্য দাবী। এ দাবী পূরণ হওয়া নয় বরং পূরণ না হওয়াটাই সম্পূর্ণ বুদ্ধিবিরোধী ও অযৌক্তিক।

১০. অর্থাৎ ব্যক্তিগত জ্ঞান, যা সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

১১. অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা কোনো যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, অথবা কোনো জ্ঞানের অধিকারীর পথনির্দেশনা দানের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

১২. অর্থাৎ এমন জ্ঞান, যা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব থেকে লাভ করা যায়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর বন্দেগী করে,[১৫] যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে পিছনের দিকে ফিরে যায়[১৬] তার দুনিয়াও গেলো এবং আখেরাতও। এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।[১৭] তারপর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে যারা তার না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার, এ হচ্ছে ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত।

১৩. এর তিনটি অবস্থা রয়েছে ঃ এক, মূর্খতাপ্রসূত জিদ ও হঠকারিতা। দুই, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা। তিন, যে ব্যক্তি বুঝায় ও উপদেশ দান করে তার কথায় কর্ণপাত না করা।

১৪. প্রথমে ছিল তাদের কথা যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট ছিল। আর এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা শুধু নিজেরাই পথভ্রষ্ট নয় বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

১৫. অর্থাৎ দীনি বৃত্তের মধ্যখানে নয় বরং তার এক প্রান্তে বা কিনারায় অথবা অন্য কথায় কুফর ও ইসলামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করে। যেমন কোনো দো-মনা ব্যক্তি কোনো সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি দেখে সেনাদল বিজয়লাভ করছে তাহলে তাদের সাথে মিলে যায় আর যদি দেখে পরাজিত হচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে।

১৬. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের মানসিক গঠন অপরিপক্ক, আকীদা-বিশ্বাস নড়বড়ে এবং যারা প্রবৃত্তির পূজা করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে লাভের শর্তে। তাদের ঈমান এ শর্তের সাথে জড়িত হয় যে, তাদের আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দীন তাদের কাছে কোনো স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং দুনিয়াতে তাদের কোনো ইচ্ছা ও আশা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। এসব হলে তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তার দীন তাদের কাছে খুবই ভালো। কিন্তু যখনই কোনো আপদ বালাই নেমে আসে অথবা আল্লাহর পথে কোনো বিপদ, কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হতে হয় কিংবা কোনো আকাংখা পূর্ণ হয় না তখনই আর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, রসূলের রিসালাত ও দীনের সত্যতা কোনোটার ওপরই তারা নিশ্চিত থাকে না।

يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ
الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾ إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ
يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى
السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾ وَكَذٰلِكَ
اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

সে তাদেরকে ডাকে যাদের ক্ষতি তাদের উপকারের চেয়ে নিকটতম[১৮] নিকৃষ্ট তার অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট তার সহযোগী।[১৯] (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে[২০] আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হবে ; আল্লাহ যা চান তাই করেন।[২১] যে ব্যক্তি ধারণা করে, আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তাকে কোনো সাহায্য করবেন না তার একটি রশির সাহায্যে আকাশে পৌঁছে গিয়ে ছিদ্র করা উচিত তারপর দেখা উচিত তার কৌশল এমন কোনো জিনিসকে রদ করতে পারে কিনা যা তার বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ।[২২]—এ ধরনেরই সুস্পষ্ট কথা সহযোগে আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথ দেখান।

এরপর তারা এমন প্রতিটি বেদীমূলে মাথা নোয়াতে উদ্যোগী হয় যেখানে তাদের লাভের আশা ও লোকসান থেকে বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

১৭. এখানে একটি অনেক বড় সত্যকে কয়েকটি কথায় প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। আসলে দো-মনা মুসলমানদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হয়। কাফের যখন নিজের রবের মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং পরকাল থেকে বেপরোয়া ও আল্লাহর আইনের আনুগত্য মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে বস্তুগত স্বার্থের পেছনে দৌড়াতে থাকে তখন সে নিজের পরকাল হারালেও দুনিয়ার স্বার্থ কিছু না কিছু হাসিল করেই নেয়। আর মু'মিন যখন পূর্ণ ধৈর্য, অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও স্থৈর্য সহকারে আল্লাহর দীনের আনুগত্য করে তখন যদিও পার্থিব সাফল্য শেষ পর্যন্ত তার পদ-চুম্বন করেই থাকে, তবুও যদি দুনিয়া একেবারেই তার নাগালের বাইরে চলে যেতেই থাকে, আখেরাতে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু এ দো-মনা মুসলমান নিজের দুনিয়ার স্বার্থও লাভ করতে পারে না এবং আখেরাতেও তার সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তার মন ও মস্তিষ্কের কোনো এক প্রকোষ্ঠে আল্লাহ ও আখেরাতের

অস্তিত্বের যে ধারণা রয়েছে এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক তার মধ্যে নৈতিক সীমারেখা কিছু না কিছু মেনে চলার যে প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, দুনিয়ার দিকে দৌড়াতে থাকলে এগুলো তার হাত টেনে ধরে। ফলে নিছক দুনিয়াবী ও বৈষয়িক স্বার্থ অন্বেষার জন্য যে ধরনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা একজন কাফেরের মতো তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আখেরাতের কথা চিন্তা করলে দুনিয়ার লাভ ও স্বার্থের লোভ, ক্ষতির ভয় এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে বিধিনিষেধের শৃংখলে বেঁধে রাখার ব্যাপারে মানসিক অস্বীকৃতি সেদিকে যেতে দেয় না বরং বৈষয়িক স্বার্থ পূজা তার বিশ্বাস ও কর্মকে এমনভাবে বিকৃত করে দেয় যে, আখেরাতে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে সে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারায়।

১৮. প্রথম আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, মূলত ও যথার্থই তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে তাদের ক্ষতিকে উপকারের চেয়ে নিকটতর বলা হয়েছে। কারণ, তাদের কাছে দোয়া চেয়ে এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের সামনে হাত পাতার মাধ্যমে সে নিজের ঈমান সংগে সংগেই ও নিশ্চিতভাবেই হারিয়ে বসে। তবে যে লাভের আশায় সে তাদেরকে ডেকেছিল তা অর্জিত হবার ব্যাপারে বলা যায়, প্রকৃত সত্যের কথা বাদ দিলেও প্রকাশ্য অবস্থার দৃষ্টিতে সে নিজেও একথা স্বীকার করবে যে, তা অর্জিত হওয়াটা নিশ্চিত নয় এবং বাস্তবে তা সংঘটিত হবার নিকটতর সম্ভাবনাও নেই। হতে পারে, আল্লাহ তাকে আরো বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন করার জন্য কোনো আস্তানায় তার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করেছেন। আবার এও হতে পারে যে, সে আস্তানায় সে নিজের ঈমানও বিকিয়ে দিয়ে এসেছে এবং মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হয়নি।

১৯. অর্থাৎ মানুষ বা শয়তান যে-ই হোক না কেন, যে তাকে এ পথে এনেছে সে নিকৃষ্টতম কর্মসম্পাদক ও অভিভাবক এবং নিকৃষ্টতম বন্ধু ও সাথী।

২০. অর্থাৎ যাদের অবস্থা উল্লেখিত মতলবী, ধান্দাবাজ, দো-মনা ও দৃঢ় বিশ্বাসহীন মুসলমানের মতো নয় বরং যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুব ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতকে মেনে নেবার ফায়সালা করে তারপর ভালো মন্দ যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হতে হোক এবং বিপদের পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ুক বা বৃষ্টিধারার মতো পুরস্কার ঝরে পড়ুক সর্বাবস্থায় দৃঢ়পদে সত্যের পথে এগিয়ে চলে।

২১. অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। দুনিয়ায় বা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তিনি যাকে যা চান দিয়ে দেন এবং যার থেকে যা চান ছিনিয়ে নেন। তিনি দিতে চাইলে বাধা দেবার কেউ নেই। না দিতে চাইলে আদায় করারও কেউ নেই।

২২. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু মতবিরোধ হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ

এক ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে ছাদের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٨﴾

সেজদা।

যারা ঈমান এনেছে[২৩] ও যারা ইহুদী হয়েছে[২৪] এবং সাবেয়ী,[২৫] খৃষ্টান[২৬] ও অগ্নি পূজারীরা[২৭] আর যারা শির্‌ক করেছে[২৮] তাদের সবার মধ্যে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ফায়সালা করবেন।[২৯] সব জিনিসই আল্লাহর দৃষ্টিতে আছে। তুমি কি দেখো না আল্লাহর সামনে সিজদানত[৩০] সবকিছুই যা আছে আকাশে[৩১] ও পৃথিবীতে—সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এবং বহু মানুষ[৩২] ও এমন বহু লোক যাদের প্রতি আযাব অবধারিত হয়ে গেছে ?[৩৩] আর যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই[৩৪] আল্লাহ যাকিছু চান তাই করেন।[৩৫]

দুই ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে কোনো দড়ির সাহায্যে আকাশে যাবার ও সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক।

তিন ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে গিয়ে অহীর সূত্র কেটে দেবার ব্যবস্থা করুক।

চার ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না, সে আকাশে গিয়ে তার রিযিক বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক।

পাঁচ ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে নিজের গৃহের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক।

ছয় ঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে পৌঁছে সাহায্য আনার চেষ্টা করে দেখুক।

এর মধ্যে প্রথম চারটি ব্যাখ্যা তো পূর্বাপর আলোচনার সাথে সম্পর্কহীন। আর শেষ দুটি ব্যাখ্যা যদিও পূর্বাপর আলোচনার বিষয়বস্তুর নিকটতর তবুও বক্তব্যের যথার্থ লক্ষে পৌঁছে না। ভাষণের ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার জানা যায় যে, কিনারায় দাঁড়িয়ে বন্দেগীকারী ব্যক্তিই একথা মনে করে। যতক্ষণ অবস্থা ভালো থাকে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত থাকে এবং যখনই কোনো আপদ-বিপদ বা বালা-মসিবত আসে অথবা তাকে এমন কোনো অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় যা তার কাছে অপ্রীতিকর, তখনই সে আল্লাহর পথ থেকে সরে যায় এবং সব আস্তানার বেদীমূলে মাথা ঘষতে থাকে। এ ব্যক্তির এ অবস্থা কেন ? এর কারণ সে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালায় সন্তুষ্ট নয়। সে মনে করে ভাগ্য ভাংগা-গড়ার মূল সূত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো হাতেও আছে। তাই সে আল্লাহ থেকে নিরাশ হয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার ডালি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেয়। তাই বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ ধরনের চিন্তা করে সে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখে নিতে পারে, এমন কি আকাশ চিরে ওপরে ঢুঁ মারতে পারলে তাও করে দেখে নিতে পারে, তার কোনো কৌশল আল্লাহর তাকদীরের এমন কোনো ফায়সালাকে বদলাতে পারে কি না যা তার কাছে অপ্রীতিকর ঠেকে। আকাশে পৌঁছে যাওয়া এবং ছিদ্র করা মানে হচ্ছে মানুষ যত বড় বড় প্রচেষ্টার কথা কল্পনা করতে পারে তার মধ্যে বৃহত্তম প্রচেষ্টা চালানো। এ শব্দগুলোর কোনো শাব্দিক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়।

২৩. অর্থাৎ "মুসলমান" যারা আপন আপন যুগে আল্লাহর সকল নবীকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে মেনে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা পূর্ববর্তী নবীদের সাথে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছে। তাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদাররাও ছিল এবং তারাও ছিল যারা ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু "কিনারায়" অবস্থান করে বন্দেগী করতো এবং কুফর ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান ছিলো।

২৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৭২ টীকা।

২৫. প্রাচীন যুগে সাবেয়ী নামে দুটি সম্প্রদায় সর্বজন পরিচিত ছিল। এদের একটি ছিল হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুসারী। তারা ইরাকের উচ্চভূমিতে (অর্থাৎ আল জাযীরা) বিপুল সংখ্যায় বসবাস করতো। হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুগামী হিসেবে তারা মাথায় পানি ছিটিয়ে ধর্মান্তরিত হবার পদ্ধতি মেনে চলতো। তারকা পূজারী দ্বিতীয় দলের লোকেরা নিজেদের হযরত শীশ ও হযরত ইদরিস আলাইহিমাস সালামের অনুসারী বলে দাবী করতো। তারা মৌলিক পদার্থের ওপর গ্রহের এবং গ্রহের ওপর ফেরেশতাদের শাসনের প্রবক্তা ছিল। হারান ছিল তাদের কেন্দ্র। ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল। এ দ্বিতীয় দলটি নিজেদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার কারণে বেশী খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু এখানে প্রথম দলটির কথা বলা হয়েছে। এ সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ সম্ভবত কুরআন নাযিলের সময় দ্বিতীয় দলটি এ নামে অভিহিত ছিল না।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়েদাহ, ৩৬ টীকা দেখুন।

২৭. অর্থাৎ ইরানের অগ্নি উপাসকগণ, যারা আলোক ও অন্ধকারের দুজন ইলাহর প্রবক্তা ছিল এবং নিজেদেরকে যরদৃশতের অনুসারী দাবী করতো। মায্দাকের ভ্রষ্টতা

তাদের ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সাংঘাতিকভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল। এমন কি তাদের মধ্যে সহোদর বোনের সাথে বিয়ের প্রথাও প্রচলিত ছিল।

২৮. অর্থাৎ আরব ও অন্যান্য দেশের মুশরিকবৃন্দ, যারা ওপরের বিভিন্ন দলীয় নামের মতো কোনো নামে আখ্যায়িত ছিল না। কুরআন মজীদ তাদেরকে অন্যান্য দল থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য "মুশরিক" ও "যারা শিরক করেছে" ধরনের পারিভাষিক নামে স্মরণ করছে। অবশ্য মু'মিনদের দল ছাড়া বাকি সবার আকীদা ও কর্মধারায় শিরক অনুপ্রবেশ করেছিল।

২৯. অর্থাৎ মানুষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে যে মতবিরোধ ও বিবাদ রয়েছে এ দুনিয়ায় তার কোনো ফায়সালা হবে না। তার ফায়সালা হবে কিয়ামতের দিন। সেখানে তাদের মধ্যে কারা সত্যপন্থী এবং কারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়া হবে। যদিও এক অর্থে দুনিয়ায় আল্লাহর কিতাবগুলোও এ ফায়সালা করে, কিন্তু এখানে ফায়সালা শব্দটি "বিবাদ মিটানো" এবং দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায় সংগত বিচার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে এক দলের পক্ষে এবং অন্য দলের বিপক্ষে যথারীতি ডিক্রি জারী করা হবে।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আর রা'আদ, ২৪ টীকা, সূরা আন্ নহল, ৪১-৪২ টীকা।

৩১. অর্থাৎ ফেরেশতা, নক্ষত্রমণ্ডলী এবং পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য জগতে মানুষের মতো বুদ্ধিমান জীব বা পশু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বায়ু ও আলোর মতো অ-বুদ্ধিমান ও স্বাধীন ক্ষমতাহীন যাবতীয় সৃষ্টি।

৩২. অর্থাৎ যারা নিছক বাধ্য হয়েই নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, সানন্দে ও আনুগত্যশীলতা সহকারেও তাঁকে সিজদা করে। পরবর্তী বাক্যে তাদের মোকাবিলায় মানব সম্প্রদায়ের অন্য যে দলের কথা বলা হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর সামনে নত হতে অস্বীকার করে। কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টির মতো তারাও প্রাকৃতিক আইনের বাঁধন মুক্ত নয় এবং সবার সাথে বাধ্য হয়ে সিজদা করার মধ্যে তারাও রয়েছে। নিজেদের ক্ষমতার পরিসরে বিদ্রোহের নীতি অবলম্বনের কারণে তারা আযাবের অধিকারী হয়।

৩৩. এর অর্থ হচ্ছে, যদিও কিয়ামতের দিনে এসব বিভিন্ন দলের বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া হবে তবুও যথার্থ অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী হলে যে কেউ আজো দেখতে পারে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শেষ ফায়সালা কার পক্ষে হওয়া উচিত। পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্র একই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব পূর্ণ শক্তিতে ও সর্বব্যাপীভাবে চলছে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা একথারই সাক্ষ দিচ্ছে। পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে শুরু করে আকাশের বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবাই একটি আইনের শৃংখলে বাঁধা রয়েছে এবং তা থেকে এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক নড়ার ক্ষমতা কারোর নেই। মু'মিন তো অন্তর থেকেই তাঁর কাছে মাথা নত করে কিন্তু যে নাস্তিকটি তাঁর অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং যে মুশরিকটি প্রতিটি ক্ষমতাহীন সত্তার সামনে মাথা নত করে সেও বাতাস ও পানির মতো সমানভাবে তার আনুগত্য করতে বাধ্য। কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী অলী ও দেবদেবীর মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার সামান্যতম নামগন্ধও

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ز فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ
مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا
اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾

এ দু'টি পক্ষ এদের মধ্যে রয়েছে এদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।[৩৬] এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা হয়ে গেছে,[৩৭] তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, যার ফলে শুধু তাদের চামড়াই নয়, পেটের ভেতরের অংশও গলে যাবে। আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখনই আবার তার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে, বলা হবে, এবার দহন জ্বালার স্বাদ নাও।

নেই। তাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ক্ষমতা ও উপাস্য হবার মর্যাদা দান করা অথবা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভুর সম জাতীয় ও সদৃশ গণ্য করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কোনো শাসকবিহীন আইন, স্রষ্টাবিহীন প্রকৃতি ও পরিচালকবিহীন ব্যবস্থার পক্ষে এত বড় বিশ্ব-জাহানকে অস্তিত্ব দান করা, নিজেই তাকে সুষ্ঠ নিয়ম-শৃংখলার সাথে পরিচালনা করা এবং এ বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ও প্রজ্ঞার বিস্ময়কর কর্মকুশলতা দেখানো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। বিশ্ব-জাহানের এ উন্মুক্ত গ্রন্থটি সামনে থাকার পরও যে ব্যক্তি নবীদের কথা মানে না এবং বিভিন্ন মনগড়া বিশ্বাস অবলম্বন করে আল্লাহর ব্যাপারে বিরোধে প্রবৃত্ত হয় তার মিথ্যাশ্রয়ী হওয়া ঠিক তেমনিভাবে প্রমাণিত যেমন কিয়ামতের দিন প্রমাণিত হবে।

৩৪. এখানে লাঞ্ছনা ও সম্মান অর্থ সত্য অস্বীকার ও তার অনুসরণ। কারণ, লাঞ্ছনা ও সম্মানের আকারেই এর অনিবার্য ফল দেখা যায়। যে ব্যক্তি চোখ মেলে প্রকাশ্য ও উজ্জল সত্য দেখে না এবং যে তাকে বুঝায় তার কথাও শোনে না সে নিজেই নিজের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার ডাক দেয়। সে নিজে যা প্রার্থনা করে আল্লাহ তার ভাগ্যে তাই লিখে দেন। তারপর আল্লাহই যখন তাকে সত্য অনুসরণ করার মর্যাদা দান করেননি তখন তাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার ক্ষমতা আর কার আছে?

৩৫. এখানে তেলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব। সূরা হজ্জের এ সিজদাটির ব্যাপারে সবাই একমত। তেলাওয়াতের সিজদার তত্বজ্ঞান, তাৎপর্য ও বিধান জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ ১৫৭ টীকা।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

(অন্যদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তো দিয়ে সাজানো হবে[৩৮] এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদেরকে পবিত্র কথা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে[৩৯] এবং তাদেরকে দেখানো হয়েছে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী সম্পন্ন আল্লাহর পথ।[৪০]

৩৬. এখানে আল্লাহ সম্পর্কে বিরোধকারী সমস্ত দলগুলোকে তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দুটি পক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি পক্ষ নবীদের কথা মেনে নিয়ে আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় পক্ষ নবীদের কথা মানে না এবং তারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে। তাদের মধ্যে বহু মতবিরোধ রয়েছে এবং তাদের কুফরীর বিভিন্ন বিচিত্র রূপও পরিগ্রহ করেছে।

৩৭. ভবিষ্যতে যে বিষয়টির ঘটে যাওয়া একেবারে সুনিশ্চিত তার প্রতি জোর দেবার জন্য সেটি এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যেন তা ঘটে গেছে। আগুনের পোশাক বলতে সম্ভবত এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যাকে সূরা ইবরাহীমের ৫০ আয়াতে سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ বলা হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইবরাহীম ৫৮ টীকা।

৩৮. তাদেরকে রাজকীয় ও জাঁকালো পোশাক পরানো হবে, এ ধারণা দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। কুরআন নাযিলের যুগে রাজা-বাদশাহ ও বড় বড় ধনীরা সোনা ও মণি-মুক্তার অলংকার পরতেন। আমাদের যুগেও উপমহাদেশের রাজা-মহারাজা ও নওয়াবরাও এ ধরনের অলংকার পরতেন।

৩৯. যদিও পবিত্র কথা শব্দের অর্থ ব্যাপক কিন্তু এখানে এর অর্থ হচ্ছে সে কালেমায়ে তাইয়েবা ও সৎ আকীদ-বিশ্বাস যা গ্রহণ করে সে মু'মিন হয়েছে।

৪০. যেমন ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে, আমার মতে এখানে সূরার মক্কী যুগে অবতীর্ণ অংশ শেষ হয়ে যায়। এ অংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কী সূরাগুলোর মতো। এর মধ্যে এমন কোনো আলামতও নেই যা থেকে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সম্ভবত

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

যারা কুফরী করেছে[৪১] এবং যারা (আজ) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে আর সেই মসজিদে হারামের যিয়ারতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে[৪২] যাকে আমি তৈরি করেছি সব লোকের জন্য যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান।[৪৩] (তাদের নীতি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য) এখানে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্যতা থেকে সরে গিয়ে যুলুমের পথ অবলম্বন করবে৪৪ তাকেই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদান করাবো।

এর পুরো অংশটি বা এর কোনো একটি অংশ মাদানী যুগে নাযিল হয়। শুধুমাত্র এ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (এ দু'টি দল যাদের মধ্যে তাদের রবের ব্যাপারে বিরোধ আছে) আয়াতটির ব্যাপারে কোনো কোনো তাফসীরকার একথা বলেন যে, এটি মাদানী আয়াত। কিন্তু তাদের এ বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে, তারা বদর যুদ্ধের দুই পক্ষকে এখানে দুই পক্ষ ধরেছেন। অথচ এটি কোনো মজবুত ভিত্তি নয়। কারণ, এখানে যে দুই পক্ষের দিকে ইংগিত করা হয়েছে এর আগে ও পরে এমন কোনো জিনিস নেই যা থেকে এ ইংগিতকে বদর যুদ্ধের দুই পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়। শব্দগুলোর অর্থ ব্যাপক এবং পরবর্তী ইবারত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, এখানে কুফর ও ঈমানের এমন বিরোধের কথা বলা হয়েছে যা শুরু থেকে চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এর সম্পর্ক যদি বদর যুদ্ধের দুই পক্ষের সাথে থাকতো তাহলে এর জায়গা হতো সূরা আনফালে, এ সূরায় নয় এবং এ বক্তব্য ধারার মধ্যেও নয়। এ তাফসীর পদ্ধতি যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, কুরআনের আয়াতগুলো একেবারে বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল হয়েছে এবং তারপর সেগুলোকে কোনো প্রকার সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছাড়াই এমনিই যেখানে ইচ্ছা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপনা ও শৃংখলা এ ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

৪১. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। পরবর্তী বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফেরদের কথা বলা হচ্ছে।

৪২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে হজ্জ ও উমরাহ করতে দেয় না।

৪৩. অর্থাৎ যা কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোত্রের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। বরং সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত, যার যিয়ারত থেকে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই।

এখানে ফিকাহর দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে ঃ

প্রথমত মসজিদে হারাম অর্থ কি ? এটা কি শুধু মসজিদকে বুঝাচ্ছে না সমগ্র মক্কা নগরীকে ?

দ্বিতীয়ত এখানে "আকিফ" (অবস্থানকারী) ও "বাদ" (বহিরাগত)-এর অধিকার সমান হবার অর্থ কি ?

এক দলের মতে এর অর্থ শুধু মসজিদ, সমগ্র মক্কা নগরী নয়। কুরআনের শব্দাবলীর বাহ্যিক অর্থ থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়। এখানে অধিকার সমান হবার অর্থ ইবাদাত করার সমান অধিকার। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে জানা যায় ঃ

يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِّى مِنْكُمْ مِنْ أُمُوْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ اَوْ صَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ

"হে আবদে মান্নাফের সন্তানগণ ! তোমাদের যে কেউ জনগণের বিষয়াদির ওপর কোনো প্রকার কর্তৃত্বের অধিকারী হবে তার পক্ষে রাতে ও দিনের কোনো সময় কোনো ব্যক্তির কাবাগৃহের তওয়াফ করা অথবা নামায পড়ায় বাধা দেয়া উচিত নয়।"

এ অভিমতের সমর্থকরা বলেন, মসজিদে হারাম বলতে পুরা হারাম শরীফ মনে করা এবং তারপর সেখানে সবদিক দিয়ে স্থানীয় অধিবাসী ও বাইর থেকে আগতদের অধিকার সমান গণ্য করা ভুল। কারণ মক্কার ঘরবাড়ী ও জমি জমার ওপর লোকদের মালিকানা, অধিকার, উত্তরাধিকার এবং কেনা-বেচা ও ইজারা দেবার অধিকার ইসলামপূর্ব যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামের আগমনের পরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলে মক্কার কারাগার নির্মাণের জন্য সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার গৃহ চার হাজার দিরহামে কিনে নেয়া হয়। কাজেই এ সাম্য শুধুমাত্র ইবাদাতের ব্যাপারে, অন্য কোনো বিষয়ে নয়। এটি ইমাম শাফেঈ ও তাঁর সমমনা লোকদের উক্তি।

দ্বিতীয় দলটির মতে, মসজিদে হারাম বলতে মক্কার সমগ্র হারাম শরীফকে বুঝনো হয়েছে। এর প্রথম যুক্তি হচ্ছে, এ সংশ্লিষ্ট আয়াতটিতেই মক্কার মুশরিকদেরকে যে বিষয়ে তিরস্কার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মুসলমানদের হজ্জে বাধা হওয়া। তাদের এ কাজকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, সেখানে সবার অধিকার সমান। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, হজ্জ কেবল মসজিদে হয় না বরং সাফা ও মারওয়া থেকে নিয়ে মিনা, মুযদালিফা, আরাফাত সবই হজ্জ অনুষ্ঠানের স্থানের অন্তরভুক্ত। তারপর কুরআনে শুধু এক জায়গায়ই নয়, অসংখ্য জায়গায় মসজিদে হারাম বলে সমগ্র হারাম শরীফ ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ

"মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে হারাম মাসে যুদ্ধ করার চাইতে বড় গুনাহ।"
(আল বাকারাহ ঃ ২১৭ আয়াত)

বলাবাহুল্য, এখানে মসজিদে হারামে যারা নামায পড়ায় রত তাদেরকে বের করা নয় বরং মক্কা থেকে মুসলমান অধিবাসীদেরকে বের করা বুঝানো হয়ছে। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"এ সুবিধা তার জন্য যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয় ।"
(আল বাকারাহ ঃ ১৯৬)

এখানেও মসজিদে হারাম বলতে সমগ্র মক্কার হারাম শরীফ, নিছক মসজিদ নয়। কাজেই "মসজিদে হারাম" সাম্যকে শুধুমাত্র মসজিদের মধ্যে সাম্য গণ্য করা যেতে পারে না বরং এটি হচ্ছে মক্কার হারামের মধ্যে সাম্য।

তারপর এ দলটি আরো বলে, সাম্য ও সমান অধিকার শুধুমাত্র ইবাদাত, সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নয় বরং মক্কার হারামে সকল প্রকার অধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে। এ দেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত। কাজেই এর এবং এর ইমারত-সমূহের ওপর কারো মালিকানা অধিকার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জায়গায় অবস্থান করতে পারে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না এবং কোনো উপবেশনকারীকে উঠিয়ে দিতেও পারে না। এর প্রমাণ স্বরূপ তারা অসংখ্য হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও কর্ম পেশ করে থাকেন। যেমন,

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تواجر بيوتها

"মক্কা মুসাফিরদের অবতরণস্থল, এর জমি বিক্রি করা যাবে না এবং এর গৃহসমূহের ভাড়া আদায় করাও যাবে না।"

ইবরাহীম নাখ্ঈ সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই একটি (মুরসাল) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللّٰهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلاَ اِجَارَةَ بُيُوْتِهَا.

"মক্কাকে আল্লাহ হারাম গণ্য করেছেন। এর জমি বিক্রি করা এবং এর গৃহসমূহের ভাড়া আদায় করা হালাল নয়।"

(উল্লেখ করা যেতে পারে, ইবরাহীম নাখ্ঈর মুরসাল তথা সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়া বর্ণিত হাদীস মারফু' তথা সাহাবীর নাম উল্লেখ সহ বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত)। কারণ, তাঁর সর্বজন পরিচিত নিয়ম হচ্ছে, যখন তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই (মুরসাল) কোনো হাদীস বর্ণনা করেন তখন আসলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মাধ্যমেই বর্ণনা

করেন। মুজাহিদও প্রায় এ একই শব্দাবলীর মাধ্যমে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। 'আলকামাহ ইবনে ফাদলাহ বর্ণনা করেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর, উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমের আমলে মক্কার জমিকে পতিত জমি মনে করা হতো। যার প্রয়োজন হতো এখানে থাকতো এবং প্রয়োজন ফুরালে অন্য কাউকে বসিয়ে দিতো।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর (রা) হুকুম দিয়েছিলেন যে, হজ্জের সময় মক্কার কোনো লোক নিজের দরজা বন্ধ করতে পারবে না। বরং মুজাহিদ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা) মক্কাবাসীদেরকে নিজেদের বাড়ির আঙিনা খোলা রাখার হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন এবং আগমনকারীদেরকে তাদের ইচ্ছামতো স্থানে অবস্থান করতে দেয়ার জন্য আঙিনায় দরজা বসাতে নিষেধ করতেন। আতাও এ একই কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত উমর (রা) একমাত্র সোহাইল ইবনে আমরকে আঙিনায় দরজা বসাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ, ব্যবসায় ব্যাপদেশে তাঁকে নিজের উট সেখানে আটকে রাখতে হতো।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি মক্কার গৃহের ভাড়া নেয় সে নিজের পেট আগুন দিয়ে ভরে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি হচ্ছে, আল্লাহ মক্কার সমগ্র হারামকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবার অধিকার সমান। বাইরের লোকদের থেকে ভাড়া আদায় করার কোনো অধিকার মক্কার লোকদের নেই।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মক্কার গভর্ণরের নামে ফরমান জারি করেন যে, মক্কার গৃহের ভাড়া নেয়া যাবে না। কারণ, এটা হারাম।

এসব রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক তাবেঈ এমত পোষণ করেন এবং ফকীহগণের মধ্যে ইমাম মালেক (র), ইমাম আবু হানীফা (র), সুফিয়ান সওয়ারী (র), আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়াহও এ মতের অনুসারী হয়েছেন যে, মক্কার জমি বেচা-কেনা করা এবং কমপক্ষে হজ্জ মওসুমে মক্কার গৃহের ভাড়া আদায় করা জায়েয নয়। তবে অধিকাংশ ফকীহ মক্কার গৃহসমূহের ওপর জনগণের মালিকানা অধিকার স্বীকার করেছেন এবং জমি হিসেবে নয়, গৃহ হিসেবে সেগুলো বেচা-কেনা বৈধ গণ্য করেছেন।

এ অভিমতটিই আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের কাছাকাছি মনে হয়। কারণ, আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের ওপর হজ্জ এ জন্য ফরয করেননি যে, এটা মক্কার মুসলমানদের উপার্জনের একটা উপায় হবে এবং যেসব মুসলমান ফরয পালনের জন্য বাধ্য হয়ে সেখানে যাবে তাদের কাছ থেকে সেখানকার গৃহমালিক ও জমি মালিকগণ ভাড়া আদায় করে লুটের বাজার গরম করবেন। বরং সেগুলো সকল ঈমানদারের জন্য ব্যাপকভাবে ওয়াকফকৃত। তার জমির ওপর কারোর মালিকানা নেই। প্রত্যেক যিয়ারতকারী তার ইচ্ছামত যে কোনো জায়গায় অবস্থান করতে পারে।

৪৪. এখানে নিছক কোনো বিশেষ কাজ নয় বরং এমন প্রত্যেকটি কাজই বুঝানো হয়েছে যা সত্য থেকে বিচ্যুত এবং জুলুমের সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। যদিও সকল অবস্থায়

এ ধরনের কাজ করা পাপ কিন্তু হারাম শরীফে একাজ করা আরো অনেক বেশী মারাত্মক পাপ। মুফাস্‌সিরগণ বিনা প্রয়োজনে কসম খাওয়াকে পর্যন্ত হারাম শরীফের মধ্যে বেদীনী গণ্য করেছেন এবং একে এ আয়াতের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সমস্ত সাধারণ গোনাহ ছাড়া হারাম শরীফের মর্যাদার সাথে জড়িত যে বিশেষ বিধানগুলো আছে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা সুস্পষ্টভাবে গোনাহের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। যেমন ঃ

হারামের বাইরে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে অথবা এমন কোনো অপরাধ করে যার ফলে তার ওপর শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তারপর সে হারাম শরীফে আশ্রয় নেয়, তাহলে যতক্ষণ সে সেখানে থাকে তার ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। হারামের এ মর্যাদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে চলে আসছে। মক্কা বিজয়ের দিন শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্য এ হুরমত উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল তারপর আবার চিরকালের জন্য তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুরআন বলেছে ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا "যে এর মধ্যে প্রবেশ করলো সে নিরাপত্তাধীন হয়ে গেলো।" বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি আমরা নিজেদের পিতৃহন্তাকেও সেখানে পাই তাহলে তার গায়েও হাত দেবো না। এ কারণে অধিকাংশ তাবেঈ, হানাফী, হাম্বলী ও আহলে হাদীস উলামা হারামের বাইরে অনুষ্ঠিত অপরাধের শাস্তি হারামের মধ্যে দেয়া যেতে পারে না বলে মত পোষণ করেন।

সেখানে যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম। মক্কা বিজয়ের পর দ্বিতীয় দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "হে লোকেরা ! আল্লাহ সৃষ্টির শুরু থেকেই মক্কাকে হারাম করেছেন এবং আল্লাহর মর্যাদাদানের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এটি মর্যাদাসম্পন্ন তথা হারাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য এখানে রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয়।" তারপর তিনি বলেছিলেন, "যদি আমার এ যুদ্ধকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে কোনো ব্যক্তি এখানে রক্তপাত বৈধ করে নেয় তাহলে তাকে বলে দাও, আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য এটা বৈধ করেছিলেন, তোমার জন্য নয়। আর আমার জন্যও এটা মাত্র একটি দিনের একটি সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল, আবার আজ গতকালের মতই তার হারাম হওয়ার হুকুম সেই একইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

সেখানকার প্রাকৃতিক গাছপালা কাটা যেতে পারে না। জমিতে স্বতঃ উৎপাদিত ঘাস তুলে ফেলা যেতে পারে না এবং পাখ-পাখালী ও অন্যান্য জন্তু জানোয়ার শিকার করাও যেতে পারে না। হারামের বাইরে শিকার করার জন্য সেখান থেকে প্রাণীদের তাড়িয়ে বাইরে আনাও যেতে পারে না। শুধুমাত্র সাপ, বিছা ইত্যাদি অনিষ্টকারী প্রাণীগুলো এর অন্তরভুক্ত নয়। আর ইযখির (এক ধরনের সুগন্ধি ঘাস) ও শুকনা ঘাসকে স্বতঃউৎপাদিত ঘাস থেকে আলাদা করা হয়েছে। এসব ব্যাপারে সহী হাদীসসমূহে পরিষ্কার বিধান রয়েছে।

সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস উঠানো নিষেধ। যেমন আবু দাউদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (কাবাঘর) জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম (এ নির্দেশনা সহকারে) যে, আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও রুকূ'-সিজদা-কিয়ামকারীদের জন্য পবিত্র' রাখো[৪৫] এবং লোকদেরকে হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও, তারা প্রত্যেকে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে চড়ে[৪৬] তোমার কাছে আসবে,[৪৭] যাতে এখানে তাদের জন্য যে কল্যাণ রাখা হয়েছে তা তারা দেখতে পায়[৪৮] এবং তিনি তাদেরকে যেসব পশু দান করেছেন তার উপর কয়েকটি নির্ধারিত দিনে আল্লাহর নাম নেয়[৪৯] নিজেরাও খাও এবং দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকেও খাওয়াও।[৫০]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস উঠাতে নিষেধ করে দিয়েছেন।"

যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহর নিয়তে আসে সে ইহরাম না বেঁধে সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তবে অন্য কোনো নিয়তে সেখানে প্রবেশকারীর জন্য ইহরাম বাঁধা অপরিহার্য কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ইবনে আব্বাসের মত হচ্ছে, কোনো অবস্থায়ই ইহরাম না বেঁধে সেখানে প্রবেশ করা যেতে পারে না। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর একটি করে উক্তিও এ মতের সপক্ষে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র তাদের এই ইহরাম বাঁধতে হবে না যাদের নিজেদের কাজের জন্য বারবার সেখানে যাওয়া-আসা করতে হয়। বাকি সবাইকে ইহরাম বাঁধতে হবে। এটি হচ্ছে ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেঈর দ্বিতীয় উক্তি। তৃতীয় মতটি হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি মীকাতের (হারাম শরীফের মধ্যে প্রবেশের সময় যেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়) সীমানার মধ্যে বাস করে সে ইহরাম না বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু মীকাতের সীমানার বাইরে অবস্থানকারীরা বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটি ইমাম আবু হানীফার উক্তি।

৪৫. কোনো কোনো মুফাস্‌সির হযরত ইবরাহীমকে (আ) যে ফরমান দেয়া হয়েছিল "পবিত্র রাখো" পর্যন্তই তা শেষ করে দিয়েছেন এবং "হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও" নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু বক্তব্যের ধরন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এ সম্বোধনও হযরত ইবরাহীমের প্রতিই করা হয়েছে এবং তাঁকে কাবাঘর নির্মাণের সময় যে হুকুম দেয়া হয়েছিল এটি তারই একটি অংশ। এ ছাড়াও এখানে বক্তব্যের মূল লক্ষ হচ্ছে একথা বলা যে, প্রথম দিন থেকেই এ ঘরটি এক আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল এবং আল্লাহর বন্দেগীকারী সকল মানুষের এখানে আসার সাধারণ অনুমতি ছিল।

৪৬. মূলে ضامر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি বিশেষ করে শীর্ণ ও ক্ষীণকায় উটের প্রতিশব্দ হিসেবে বলা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য এমন সব মুসাফিরের ছবি তুলে ধরা যারা দূর-দূরান্ত থেকে চলে আসছে এবং পথে তাদের উটগুলো খাদ্য ও পানীয় না পাওয়ার কারণে শীর্ণকায় হয়ে গেছে।

৪৭. শুরুতে হযরত ইবরাহীমকে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল এখানে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সামনের দিকে যা বলা হয়েছে তা এর সাথে বাড়তি সংযোজন। অতিরিক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে এ সংযোজন করা হয়েছে। আমাদের এ অভিমতের কারণ হচ্ছে এই যে, "এই প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে" পর্যন্তই এই বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এটি কাবাঘর নির্মাণের কাজ শেষ হবার সময় বলা হয়ে থাকবে। (হযরত ইবরাহীমের কাবাঘর নির্মাণ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন সূরা বাকারার ১২৫-১২৯, আলে ইমরান ৯৬-৯৭ এবং ইবরাহীম ৩৫-৪১ আয়াত)

৪৮. এখানে কেবলমাত্র দীনী কল্যাণের কথাই বলা হয়নি, এর সাথে পার্থিব কল্যাণও সংযুক্ত রয়েছে। এ কাবাঘর ও হজ্জের বরকতই হযরত ইবরাহীমের (আ) যুগ থেকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছর ধরে আরবরা একটি ঐক্যকেন্দ্র লাভ করেছে। এটিই তাদের আরবীয় অস্তিত্বকে গোত্রবাদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করেছে। কেন্দ্রের সাথে এর সংযুক্তি এবং হজ্জের জন্য প্রতি বছর দেশের সব এলাকা থেকে লোকদের এখানে আসা যাওয়ার কারণে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক থাকে, তাদের মধ্যে আরব হবার অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং তারা চিন্তা ও তথ্য সরবরাহ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের সুযোগ লাভ করে। তারপর এ হজ্জের বরকতই আরবের যাবতীয় সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতা অন্তত চারমাসের জন্য স্থগিত হয়ে যেতো এবং সে সময় এমন ধরনের নিরাপত্তা লাভ করা যেতো যার মধ্যে দেশের সকল এলাকার লোকেরা সফর করতে পারতো এবং বাণিজ্য কাফেলাও নিরাপদে চলাফেরা করতে সক্ষম হতো। এজন্য আরবের অর্থনৈতিক জীবনের জন্যও হজ্জ একটি রহমত ছিল। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ৮০-৮১ এবং আল মায়েদাহ ১১৩ টীকা।

ইসলামের আগমনের পরে হজ্জের দীনী কল্যাণের সাথে সাথে পার্থিব কল্যাণও কয়েকগুণ বেশী হয়ে গেছে। প্রথমে তা ছিল কেবলমাত্র আরবের জন্য রহমত, এখন হয়ে গেছে সারা দুনিয়ার তাওহীদবাদীদের জন্য রহমত।

বাবে উমরা
বাবে ইবরাহীম
বাবে বিদা
বাবে সালাম
বাবে নবী (স)
হাতিম
খানায়ে কা'বা
কা'বার দরজা
মুলতাজিম
মাতাফ
মাতাফ
সাফা
মিলিনে আখদারিন
সাফা মারওয়া সায়ির পথ
পশ্চিম
উত্তর
দক্ষিন
পূর্ব

কা'বা শরীফের নক্সা
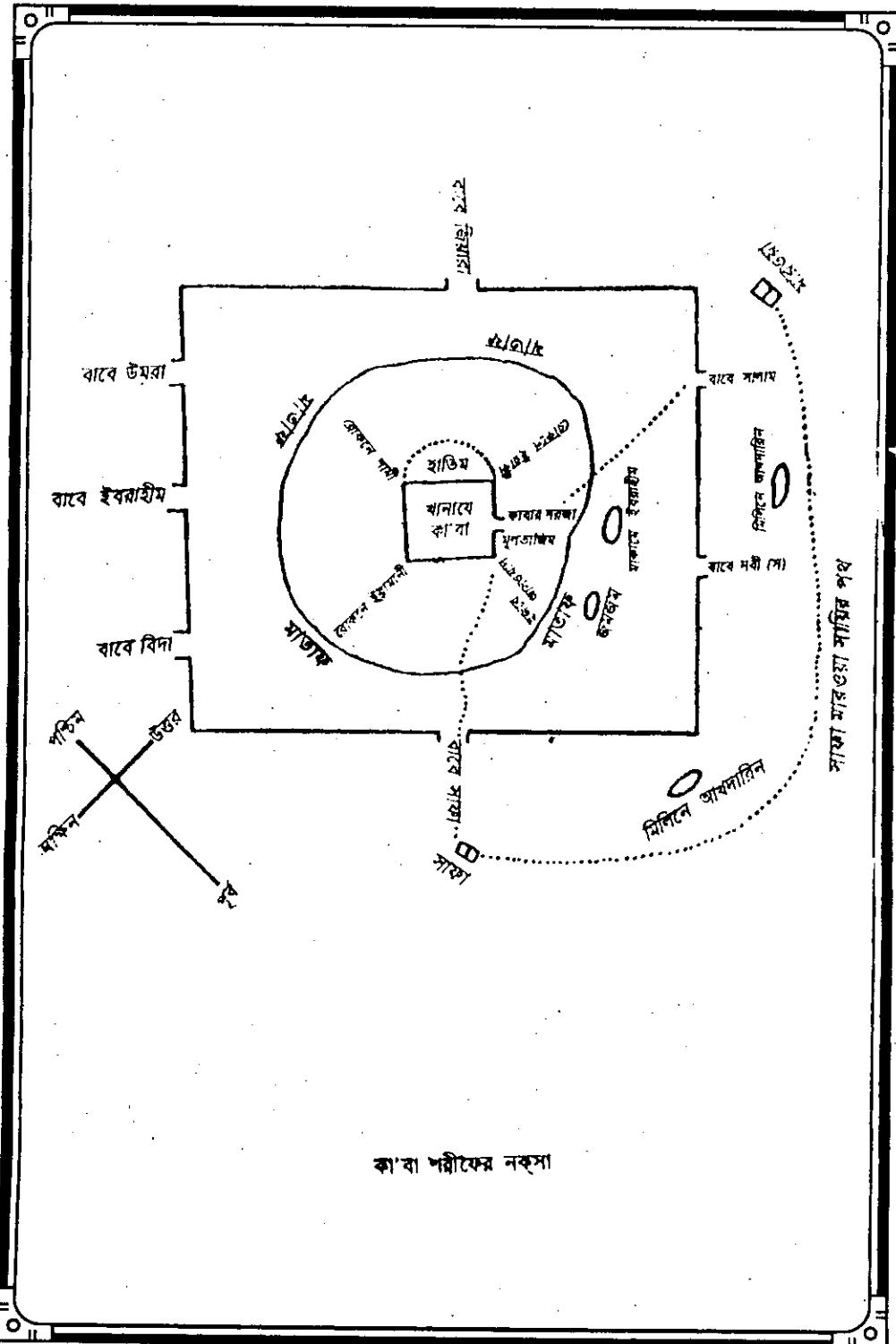
৪৯. পশু বলতে এখানে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উট, গুরু, ছাগল, ভেড়া যেমন সূরা আনআমের ১৪২-১৪৪ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদের উপর আল্লাহর নাম নেবার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নামে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাদেরকে যবেহ্ করা যেমন পরবর্তী বাক্য নিজেই বলে দিচ্ছে। কুরআন মজীদে কুরবানীর জন্য সাধারণভাবে "পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া"র পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সব জায়গায়ই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে পশু যবেহ করা। এভাবে যেন এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ্ করা কাফের ও মুশরিকদের পদ্ধতি। মুসলমান যখনই পশু যবেহ্ করবে আল্লাহর নাম নিয়ে করবে এবং যখনই কুরবানী করবে আল্লাহর জন্য করবে।

কয়েকটি নির্ধারিত দিন বলতে কোন্ দিনের কথা বুঝানো হয়েছে ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একটি মত হচ্ছে, এর অর্থ, যিলহজ্জের প্রথম দশটি দিন। ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী, ইবরাহীম নখ্ঈ, কাতাদাহ্ এবং অন্যান্য বহু সাহাবী ও তাবেঈনের এ মত উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র)-ও এ মতের পক্ষে। ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদেরও.(র) একটি উক্তি এর সমর্থনে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এর অর্থ, ইয়াওমুন নাহর (অর্থাৎ ১০ যিলহজ্জ) এবং তার পরের তিন দিন। এর সমর্থনে ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমর (রা), ইবরাহীম নখ্ঈ, হাসান ও আতার উক্তি পেশ করা হয়। ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদেরও (র) একটি উক্তি এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তৃতীয় মতটি হচ্ছে, এর অর্থ তিন দিন তথা ইয়াওমুন নাহ্র (কুরবানীর ঈদের দিন) এবং এর পরের দু'দিন। এর সমর্থনে হযরত উমর (রা), আলী (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা), আবু হুরাইরাহ (রা), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রা) ও সাঈদ ইবনে জুবায়েরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। ফকীহগণের মধ্য থেকে সুফিয়ান সাওরী (র), ইমাম মালেক (র) ইমাম আবু ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। হানাফী ও মালেকী মাযহাবে এ মতের ভিত্তিতেই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এছাড়া কিছু একক উক্তি আছে। যেমন কেউ কুরবানীর দিনগুলোকে পহেলা মহররমের দিন পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন। কেউ শুধুমাত্র ইয়াওমুন নাহরের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কেউ ইয়াওমুন নাহরের পরে মাত্র আর একদিন কুরবানীর দিন হিসেবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এগুলো দুর্বল উক্তি। এসবের পেছনে শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ নেই।

৫০. কেউ কেউ এ বক্তব্যের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, খাওয়া ও খাওয়ানো উভয়টিই ওয়াজিব। কারণ, এখানে আদেশসূচক ক্রিয়াপদের মাধ্যমে হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্য একটি দলের মতে, খাওয়া হচ্ছে মুস্তাহাব এবং খাওয়ানো ওয়াজিব। ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেঈ (র) এ মত প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় দল বলেন, খাওয়া ও খাওয়ানো দু'টোই মুস্তাহাব। খাওয়া মুস্তাহাব হবার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহেলী যুগে লোকেরা নিজেদের কুরবানীর গোশত নিজেদের খাওয়া নিষেধ মনে করতো। আর খাওয়ানো এজন্য পছন্দনীয় যে, এর মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়। এটি ইমাম আবু

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

তারপর নিজেদের ময়লা দূর করে,[৫১] নিজেদের মানত পূর্ণ করে[৫২] এবং এ প্রাচীন গৃহের তাওয়াফ করে।[৫৩]

এ ছিল (কাবা নির্মাণের উদ্দেশ্য) এবং যে কেউ আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোকে সম্মান করবে, তার রবের কাছে এ হবে তারই জন্য ভালো।[৫৪]

আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে,[৫৫] সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদের বলে দেয়া হয়েছে।[৫৬] কাজেই মূর্তিসমূহের আবর্জনা থেকে বাঁচো,[৫৭] মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকো,[৫৮] একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেলো। এখন হয় তাকে পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দেবে যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।[৫৯]

হানীফার (র) মত। হাসান বসরী, আতা, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ্ঈ থেকে ইবনে জারীর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, فَكُلُوْا مِنْهَا এর মধ্যে আদেশসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের কারণে খাওয়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এ হুকুমটি ঠিক তেমনি যেমন বলা হয়েছে وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا "যখন তোমরা ইহরামের অবস্থা থেকে বের হয়ে আসো তখন আবার শিকার করো।" (আল মায়েদাহ ঃ ২) এবং فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ "তারপর যখন শেষ হয়ে যায় তখন আবার পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ো।" (আল জুমআহ ঃ ১০) এর অর্থ এই নয় যে, ইহরাম থেকে বের হয়ে শিকার করা এবং জুমআর নামায শেষে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়া ওয়াজিব। বরং এর অর্থ হচ্ছে ঃ এরপর এমনটি করার পথে কোনো বাধা নেই। অনুরূপভাবে এখানেও যেহেতু

লোকেরা কুরবানীর গোশত নিজেদের খাওয়া নিষিদ্ধ মনে করতো তাই বলা হয়েছে ঃ না, তা খাও অর্থাৎ এটা মোটেই নিষিদ্ধ নয়।

দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে আহার করানোর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তিকে আহার করানো যেতে পারে না। বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অভাবী না হলেও তাদেরকে কুরবানীর গোশত দেয়া জায়েয। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত। আলকামা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমার হাতে কুরবানীর পশু পাঠান এবং নির্দেশ দেন, কুরবানীর দিন একে যবেহ করবে, নিজে খাবে, মিসকীনদেরকে দেবে এবং আমার ভাইয়ের ঘরে পাঠাবে। ইবনে উমরও (রা) একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ একটি অংশ খাও, একটি অংশ প্রতিবেশীদেরকে দাও এবং একটি অংশ মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করো।

৫১. অর্থাৎ ইয়াওমুন নাহরে (১০ যিলহজ্জ) কুরবানীর কাজ শেষ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে, ক্ষৌরকর্ম করবে, গোছল করবে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলবে এবং ইহরাম অবস্থায় যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল সেগুলো খতম করে দেবে। تَفَثٌ এর আসল আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সফরকালে যেসব ধূলো-ময়লা মানুষের গায়ে লেগে যায়। কিন্তু হজ্জ প্রসংগে যখন ধূলো-ময়লা দূর করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তখন এর সে একই অর্থ গ্রহণ করা হবে যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, হাজী যতক্ষণ পর্যন্ত হজ্জের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলী ও কুরবানীর কাজ শেষ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি চুল ও নখ কাটতে পারবেন না এবং শরীরের অন্য কোনো পরিচ্ছন্নতার কাজও করতে পারবেন না। (এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, কুরবানীর কাজ শেষ করার পর অন্যান্য যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায় কিন্তু স্ত্রীর কাছে যাওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হয় না যতক্ষণ না "তাওয়াফে ইফাদাহ" শেষ করা হয়।)

৫২. অর্থাৎ এ সময়ের জন্য যে ব্যক্তি কোনো মানত করে।

৫৩. কাবাঘরের জন্য اَلْعَتِيْقِ। بَيْتُ শব্দ অত্যন্ত অর্থবহ। "আতীক" শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে প্রাচীন। দ্বিতীয় অর্থ স্বাধীন, যার ওপর কারোর মালিকানা নেই। তৃতীয় অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। এ তিনটি অর্থই এ পবিত্র ঘরটির বেলায় প্রযোজ্য।

তাওয়াফ বলতে "তাওয়াফে ইফাদাহ" অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত বুঝানো হয়েছে। ইয়াওমুন নাহরে (কুরবানীর দিন) কুরবানী করার ও ইহরাম খুলে ফেলার পর এ তাওয়াফ করা হয়। এটি হজ্জের রোকন তথা ফরযের অন্তরভুক্ত। আর যেহেতু ধূলা-ময়লা দূর করার হুকুমের সাথে সাথেই এর উল্লেখ করা হয়েছে তাই এ বক্তব্য একথা প্রকাশ করে যে, কুরবানী করার এবং ইহরাম খুলে গোসল করে নেবার পর এ তাওয়াফ করা উচিত।

৫৪. আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা সাধারণ উপদেশ। আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত সকল মর্যাদাশালী জিনিসের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য একথা বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদে হারাম, হজ্জ, উমরাহ ও মক্কার হারামের যেসব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ বক্তব্যের সেগুলোই প্রধানতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া এর মধ্যে এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও রয়েছে যে, কুরাইশরা

হারাম থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে, তাদের জন্য হজ্জের পথ বন্ধ করে দিয়ে হজ্জের কার্যক্রমের মধ্যে জাহেলী ও মুশরীকী রীতিনীতি অন্তরভুক্ত করে এবং আল্লাহর ঘরকে শিরকের আবর্জনায় দূষিত, কলুষিত করে এমন বহু মর্যাদাশালী জিনিসের মর্যাদা বিনষ্ট করে দিয়েছে যেগুলোর মর্যাদা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

৫৫. এ প্রসংগে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি ভুল ধারণা দূর করা। প্রথমত কুরাইশ ও আরবের মুশরিকরা "বাহীরা", "সায়েবা", "অসীলা" ও "হাম"কেও আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসমূহের মধ্য গণ্য করতো। তাই বলা হয়েছে, এগুলো তাঁর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা নয়। বরং তিনি সমস্ত গৃহপালিত পশু হালাল করেছেন। দ্বিতীয়ত ইহরাম অবস্থায় যেভাবে শিকার করা হারাম তেমনিভাবে যেন একথা মনে না করা হয় যে, গৃহপালিত জন্তু যবেহ করা ও খাওয়াও হারাম। তাই বলা হয়েছে, এগুলো আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়।

৫৬. সূরা আনআম ও সূরা নাহলে যে হুকুম দেয়া হয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছে ঃ মৃত, রক্ত, শুয়োরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করা পশু। আনআম, ১৪৫ ও নাহল, ১১৫ আয়াত।

৫৭. অর্থাৎ মূর্তিপূজা থেকে এমনভাবে দূরে থাকো যেমন দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা থেকে মানুষ নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে আসে। অন্য কথায় বলা যায়, তা যেন নাপাক ও ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ণ এবং কাছে যাবার সাথে সাথেই মানুষ তার সংস্পর্শ লাভ করে নাপাক ও নোংরা হয়ে যাবে।

৫৮. যদিও শব্দগুলো এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ থেকে প্রত্যেকটি মিথ্যা, অপবাদ ও মিথ্যা সাক্ষের হারাম হওয়া প্রমাণ হয় তবুও এ আলোচনায় বিশেষভাবে এমনসব বাতিল আকিদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, রীতি-রেওয়াজ ও কল্পনা-কুসংস্কারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যেগুলোর ওপর কুফরী ও শিরকের ভিত গড়ে উঠেছে। আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করা এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে তাঁর বান্দাদেরকে অংশীদার করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এ থেকে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। আবার আরবের মুশরিকরা যে মিথ্যার ভিত্তিতে "বাহীরা", "সায়েবা" ও "হাম" ইত্যাদিকে হারাম গণ্য করতো তাও এ ফরমানের সরাসরি আওতাধীনে এসে যায়। যেমন সূরা আন নাহল-এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ـ

"আর তোমাদের কণ্ঠ যে মিথ্যা বিধান দিয়ে থাকে যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, এ ধরনের বিধান দিয়ে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করো না।" (১১৬ আয়াত)

এ সংগে মিথ্যা সাক্ষ ও মিথ্যা কসমও একই বিধানের আওতায় আসে। যেমন বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله

"মিথ্যা সাক্ষ দেওয়াকে আল্লাহর সাথে শিরক করার সমান পর্যায়ে রাখা হয়েছে।"

এরপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতটি পেশ করেছেন। ইসলামী আইনে এ অপরাধটি শাস্তিযোগ্য। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদের (র) ফতোয়া হচ্ছে, যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা সাক্ষদাতা প্রমাণিত হয়ে যাবে তার নাম চারদিকে প্রচার করে দিতে হবে এবং তাকে দীর্ঘকাল অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে। হযরত উমরও (রা) একথাই বলেছেন এবং কার্যত এ পদক্ষেপই নিয়েছেন। মাকহূলের বর্ণনা হচ্ছে হযরত উমর (রা) বলেন,

يضرب ظهره ويحلق راسه ويسخم وجهه ويطال حبسه

"তার পিঠে চাবুক মারতে হবে, মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে, মুখ কালো করে দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমের নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ হযরত উমরের (রা) আদালতে এক ব্যক্তির সাক্ষ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ফলে তিনি তাকে একদিন প্রকাশ্য জনসমাগমের স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে ওমুকের ছেলে ওমুক, এ মিথ্যা সাক্ষ দিয়েছে, একে চিনে রাখো। তারপর তাকে কারাগারে আটক করেন। বর্তমান কালে এ ধরনের লোকের নাম খবরের কাগজে ছেপে দিলেই ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

৫৯. এ উপমায় আকাশ বলতে বুঝানো হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থাকে। এ অবস্থায় সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা হয় না এবং তার প্রকৃতি তাওহীদ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে চেনে না। মানুষ যদি নবী প্রদত্ত পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করে তাহলে সে জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টি সহকারে এ প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে সে নিচের দিকে নয় বরং উপরের দিকে উঠতে থাকে। কিন্তু শিরক (এবং শুধুমাত্র শিরকই নয় বরং জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদও) গ্রহণ করার সাথে সাথেই সে নিজের প্রকৃতির আকাশ থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে যায়। তখন সে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার যে কোনোটির মুখোমুখি হয়। একটি অবস্থা হচ্ছে, শয়তান ও বিপথে পরিচালনাকারী মানুষ, যাদেরকে এ উপমায় শিকারী পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, তার নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, তার আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারা, যাদেরকে বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত কোনো গভীর খাদে নিক্ষেপ করে।

মূলে "সহীক" শব্দ বলা হয়েছে এটি 'সাহক' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। "সাহক"-এর আসল মানে হচ্ছে পিষ্ট করা। কোনো জায়গাকে এমন অবস্থায় "সাহীক" বলা হয় যখন তা

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

এ হচ্ছে আসল ব্যাপার (এটি বুঝে নাও), আর যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত রীতিনীতির[৬০] প্রতি সম্মান দেখায়, তার সে কাজ তার অন্তরের আল্লাহভীতির পরিচায়ক।[৬১]

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের ঐ সমস্ত (কুরবানীর পশু) থেকে উপকারলাভের অধিকার আছে।[৬২] তারপর ওগুলোর (কুরবানী করার) জায়গা এ প্রাচীন ঘরের নিকটেই।[৬৩]

এতবেশী গভীর হয় যে, তার মধ্যে কোনো জিনিস পড়ে গেলে তা টুকরো টুকরো বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে চিন্তা ও নৈতিক চরিত্রের অধোপতনকে এমন গভীর খাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যার মধ্যে পড়ে গিয়ে মানুষের সমস্ত কলকব্জা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

৬০. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন এটি কোনো কাজ হতে পারে। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি অথবা কোনো জিনিসও হতে পারে যেমন মসজিদ, কুরবানীর জন্য হাজীদের সংগে নেয়া উট ইত্যাদি। আরো বেশী ব্যাখার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মায়েদাহ, ৫ টীকা।

৬১. অর্থাৎ এ সম্মান প্রদর্শন হৃদয় অভ্যন্তরের তাকওয়ার ফল এবং মানুষের মনে যে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় আছে তা এরি চিহ্ন। তাইতো সে তাঁর নিদর্শনসমূহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করছে। অন্য কথায় যদি কোনো ব্যক্তি জেনে বুঝে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অমর্যাদা করে তাহলে এটা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার মনে আল্লাহর ভয় নেই। অথবা সে আল্লাহকে স্বীকারই করে না কিংবা স্বীকার করলেও তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে।

৬২. পূর্বের আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং তাকে মনের তাকওয়ার আলামত হিসেবে চিহ্নিত করার পর এ বাক্যটি একটি বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বলা হয়েছে। হাজীদের সাথে আনা কুরবানীর পশুও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত। যেমন আরববাসীরা স্বীকার করতো এবং কুরআন নিজেই পরবর্তী পর্যায়ে বলছে ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ.

"এবং এ সমস্ত কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তরভুক্ত করেছি।"

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখানোর যে হুকুম উপরে দেয়া হয়েছে তার দাবী কি এই যে, কুরবানীর পশুগুলোকে যখন আল্লাহর ঘরের দিকে

নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদেরকে কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না ? তাদের পিঠে চড়া অথবা পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দেয়া কিংবা তাদের দুধ পান করা কি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবার বিরোধী নয় ? আরবের লোকেরা একথাই মনে করতো। তারা এ পশুগুলোকে একেবারেই আরোহীশূন্য অবস্থায় সুসজ্জিত করে নিয়ে যেতো। পথে তাদের থেকে কোনো প্রকার লাভবান হওয়া তাদের দৃষ্টিতে ছিল পাপ। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে, কুরবানীর জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা এ পশুদের থেকে লাভবান হতে পারো। এটা আল্লার নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী নয়। একথাটিই এ সম্পর্কিত হযরত আবু হুরারাহ (রা) ও হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে এবং সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে। তিনি বললেন, "ওর পিঠে সওয়ার হয়ে যাও" সে বললো, এটা হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া উট। বললেন, "তাতে কি, সওয়ার হয়ে যাও।"

মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ, দ্বাহহাক ও আতা খোরাসানী এ মত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে "একটি নির্দিষ্ট সময়" মানে হচ্ছে "যতক্ষণ" পর্যন্ত পশুকে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত ও কুরবানীর পশু নামে আখ্যায়িত না করা হয়।" এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষ এ পশুগুলো থেকে কেবলমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত লাভবান হতে পারে যতক্ষণ তারা তাদেরকে কুরবানীর পশু নামে আখ্যায়িত করে না। যখনই তারা তাদেরকে কুরবানীর পশু বানিয়ে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাবার নিয়ত করে তখনই তাদের থেকে আর কোনো প্রকার লাভবান হবার অধিকার তাদের থাকে না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মোটেই সঠিক বলে মনে হয় না। প্রথমত এ অবস্থায় ব্যবহার করার ও লাভবান হবার অনুমতি দেয়াটাই অর্থহীন। কারণ কুরবানীর পশু ছাড়া অন্য পশুদের থেকে লাভবান হবার বা না হবার ব্যাপারে কবেই বা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে, সুস্পষ্ট অনুমতির মাধ্যমে তা দূর করার প্রয়োজন দেখা দেয় ? তারপর আয়াত পরিষ্কার বলছে, এমন সব পশু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যাদের ওপর "আল্লাহর নিদর্শন" শব্দ প্রযুক্ত হয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এটি কেবলমাত্র তখনই হতে পারে যখন তাদেরকে কুরবানীর পশু গণ্য করা হবে।

অন্য তাফসীরকারগণ যেমন উরওয়া ইবনে যুবাইর ও আতা ইবনে আবি রিবাহ বলেন, "নির্দিষ্ট সময়" অর্থ হচ্ছে "কুরবানীর সময়।" কুরবানীর পূর্বে এ কুরবানীর পশুগুলো সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, এদের দুধও পান করা যায়, এদের বাচ্চাও গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এদের পশম ও চুল ইত্যাদিও কাটা যেতে পারে। ইমাম শাফেঈ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। হানাফীগণ যদিও প্রথম ব্যাখ্যাটির সমর্থক তবুও সেখানে এতটুকু অবকাশ বের করেছেন যে, প্রয়োজনের শর্তে লাভবান হওয়া জায়েয।

৬৩. যেমন অন্য জায়গায় هَدْيًاۢ بٰلِغَ الْكَعْبَةِ (সূরা মায়েদাহ ৯৫ আয়াত) এর অর্থ এই নয় যে, কাবাঘরে বা মসজিদে হারামে কুরবানী করতে হবে বরং সেখানে এর অর্থ হচ্ছে হারামের সীমানার মধ্যে কুরবানী করতে হবে। কুরআন যে কাবা, বায়তুল্লাহ বা মসজিদে হারাম শব্দ উচ্চারণ করে এ থেকে সাধারণত শুধুমাত্র কাবার ইমারত নয় বরং মক্কার হারাম অর্থ গ্রহণ করে, এটি তার আর একটি প্রমাণ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

৫ রুকূ'

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর একটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি, যাতে (সে উম্মতের) লোকেরা সে পশুদের ওপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।[৬৪] (এ বিভিন্ন নিয়মের উদ্দেশ্য একই) কাজেই তোমাদের ইলাহও সে একজনই এবং তোমরা তাঁরই ফরমানের অনুগত হয়ে যাও। আর হে নবী! সুসংবাদ দিয়ে দাও বিনয়ের নীতি অবলম্বনকারীদেরকে,[৬৫] যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই তাদের ওপর আসে তার ওপর তারা সবর করে, নামায কায়েম করে এবং যাকিছু রিযিক তাদেরকে আমি দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।[৬৬]

৬৪. এ আয়াত থেকে দু'টি কথা জানা গেছে। এক, কুরবানী ছিল আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শরীয়াতের ইবাদাত ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বিশেষ। মানুষ যেসব পদ্ধতিতে গায়রুল্লাহর বন্দেগী করেছে সেগুলো সবাই গায়রুল্লাহর জন্য নিষিদ্ধ করে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে দেয়াই হচ্ছে ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদের অন্যতম মৌলিক দাবী। যেমন, মানুষ গায়রুল্লাহর সামনে রুকূ' ও সিজদা করেছে। আল্লাহর শরীয়াত একে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মানুষ গায়রুল্লাহর সামনে আর্থিক নযরানা পেশ করেছে। আল্লাহর শরীয়াত তাকে নিষিদ্ধ করে যাকাত ও সদকা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। মানুষ বাতিল উপাস্যদের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করেছে। আল্লাহর শরীয়াত কোনো একটি স্থানকে পবিত্র বা বায়তুল্লাহ গণ্য করে তার যিয়ারত ও তাওয়াফ করার হুকুম দিয়েছে। মানুষ গায়রুল্লাহর নামে রোযা রেখেছে। আল্লাহর শরীয়াত তাকেও আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক এমনিভাবে মানুষ তার নিজের মনগড়া উপাস্যদের জন্য পশু বলি করতে থেকেছে। আল্লাহর শরীয়াত পশু কুরবানীকেও গায়রুল্লাহর জন্য একেবারে হারাম এবং আল্লাহর জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছে।

দুই, এ আয়াত থেকে জানা গেছে, আল্লাহর নামে কুরবানী করাই হচ্ছে আসল জিনিস। কুরবানী কখন করা হবে, কোথায় করা হবে, কিভাবে করা হবে—এ নিয়মটির এ বিস্তারিত নিয়মাবলী মোটেই কোনো মৌলিক বিষয় নয়। বিভিন্ন যুগের, জাতির ও দেশের

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

আর কুরবানীর উটকে[৬৭] আমি করেছি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তরভুক্ত ; তোমাদের জন্য রয়েছে তার মধ্যে কল্যাণ।[৬৮] কাজেই তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে[৬৯] তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও।[৭০] আর যখন (কুরবানীর পরে) তাদের পিঠ মাটির সাথে লেগে যায়[৭১] তখন তা থেকে নিজেরাও খাও এবং তাদেরকেও খাওয়াও যারা পরিতুষ্ট হয়ে বসে আছে এবং তাদেরকেও যারা নিজেদের অভাব পেশ করে। এ পশুগুলোকে আমি এভাবেই তোমাদের জন্য বশীভূত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭২]

নবীদের শরীয়াতে অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিস্তারিত বিষয়াবলীতে পার্থক্য ছিল। কিন্তু সবার মূল প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য একই রয়েছে।

৬৫. মূলে مُخْبِتِيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো একটি মাত্র শব্দের সাহায্যে এর অন্তরনিহিত অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি অর্থ ঃ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও বিনয়াবনত ভাব অবলম্বন করা। তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া। তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া।

৬৬. আল্লাহ কখনো হারাম ও নাপাক সম্পদকে নিজের রিযিক হিসেবে আখ্যায়িত করেননি, এর আগে আমরা একথা বলেছি। তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে পাক-পবিত্র রিযিক ও যে হালাল উপার্জন আমি তাদেরকে দান করেছি তা থেকে তারা খরচ করে। আবার খরচ করা মানেও সব ধরনের যা-তা খরচ নয় বরং নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের বৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করা, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভাবীদেরকে সাহায্য করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা। অযথা খরচ, ভোগ বিলাসিতার জন্য খরচ এবং লোক দেখানো খরচকে কুরআন "খরচ" গণ্য করছে না। বরং কুরআনের পরিভাষায় এ খরচকে অমিতব্যয়িতা ও ফজুল খরচ বলা হয়। অনুরূপভাবে কার্পণ্য ও সংকীর্ণমনতা সহকারে যা খরচ করা হয়, তার ফলে মানুষ নিজের পরিবার পরিজনদেরকেও সংকীর্ণতার মধ্যে রাখে এবং নিজেও নিজের মর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না আর এই সংগে নিজের সামর্থ অনুযায়ী অন্যদেরকে সাহায্য করতেও পিছপা হয়। এ অবস্থায় মানুষ যদিও কিছু না

কিছু খরচ করে কিন্তু কুরআনের ভাষায় এ খরচের নাম "ইনফাক" নয়। কুরআন একে বলে "কৃপণতা" ও মানসিক সংকীর্ণতা।

৬৭. মূলে بُدن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি শুধুমাত্র উটের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর বিধানে গরুকেও উটের সাথে শামিল করেছেন। একটি উট কুরবানী করলে যেমন তা সাতজনের জন্য যথেষ্ট, ঠিক তেমনি সাতজন মিলে একটি গরু কুরবানী দিতে পারে। মুসলিমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْتَرِكَ فِى الْاَضَاحِى الْبُدْنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন কুরবানীতে উটের ক্ষেত্রে সাতজন এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজন শরীক হয়ে যাই।"

৬৮. অর্থাৎ তোমরা তা থেকে ব্যাপক হারে কল্যাণ লাভ করে থাকো। তোমাদের সেগুলো কেন করতে হবে সেদিকে এখানে ইংগিত করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যেসব জিনিস থেকে লাভবান হয় তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই আল্লাহর নামে কুরবানী করা উচিত, শুধুমাত্র নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নয় বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি দেবার জন্যও যাতে মানুষ মনে মনে ও কার্যত একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন এ সবই তাঁর। ঈমান ও ইসলাম হচ্ছে আত্মত্যাগের নাম। নামায ও রোযা হচ্ছে দেহ ও তার শক্তিসমূহের কুরবানীর নাম। যাকাত হচ্ছে আল্লাহ আমাদের বিভিন্নভাবে যেসব সম্পদ দিয়েছেন সেগুলোর কুরবানী। জিহাদ সময় এবং মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতাসমূহের কুরবানী। আল্লাহর পথে যুদ্ধ প্রাণের কুরবানী। এসব এক এক প্রকার নিয়ামত এবং এক একটি দানের জন্য কৃতজ্ঞতা। এভাবে পশু কুরবানী করার দায়িত্বও আমাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে আমরা আল্লাহর এ বিরাট নিয়ামতের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেই। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্ট বহু প্রাণীকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা তাদের পিঠে চড়ি। তাদের সাহায্যে চাষাবাদ ও মাল পরিবহন করি। তাদের গোশত খাই, দুধ পান করি এবং তাদের চামড়া, লোম, পশম, রক্ত, হাড় ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিস নানাভাবে ব্যবহার করি।

৬৯. উল্লেখ করা যেতে পারে, উটকে দাঁড় করিয়ে যবেহ করা হয়। তার একটি পা বেঁধে দেয়া হয় তারপর কণ্ঠনালীতে সজোরে বল্লম মারা হয়। সেখান থেকে রক্তের একটি ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে গেলে উট মাটির ওপর পড়ে যায়। 'সওয়াফ' বা দাঁড় করিয়ে রাখা বলতে এটিই বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, দ্বাহহাক প্রমুখ ব্যাখ্যাতাগণ এর এ ব্যাখ্যায়ই করেছেন। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও একথাই উদ্ধৃত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার উটকে বসিয়ে রেখে কুরবানী করতে দেখেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বলেন ঃ

اَبْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ

"পা বেঁধে তাকে দাঁড় করিয়ে দাও। এটা হচ্ছে আবুল কাশেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।"

আবু দাউদ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উটের বাম পা বেঁধে রেখে বাকি তিন পায়ের ওপর তাকে দাঁড় করিয়ে দিতেন। তারপর তার হল্‌কুমে বর্শা নিক্ষেপ করতেন। কুরআন নিজেও এ অর্থের প্রতি ইংগিত করেছে ঃ اِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا "যখন তাদের পিঠ জমিতে ঠেকে যায়" একথা এমন অবস্থায় বলা হয় যখন পশু দাঁড়িয়ে থাকে এবং তারপর জমির ওপর পড়ে যায়। অন্যথায় শুইয়ে দিয়ে কুরবানী করা অবস্থায় পিঠ তো আগে থেকেই জমির সাথে লেগে থাকে।

৭০. এ বাক্যটি আবার একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করলে কোনো পশু হালাল হয় না। তাই আল্লাহ "তাদেরকে যবেহ করো" না বলে বলছেন, "তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও" এবং এর অর্থ হচ্ছে, পশু যবেহ করো। এ থেকে একথা আপনা আপনিই বের হয়ে আসে যে, ইসলামী শরীয়াতে আল্লাহর নাম না নিয়ে পশু যবেহ করার কোনো অবকাশ নেই।

যবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার পদ্ধতি এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে فَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا "তাদের ওপর আল্লাহর নাম নাও।" আর ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ "যাতে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো।"

হাদীসে কুরবানী করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন (১) بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়, হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।" (২) اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ "আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।"

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ـ

(৩) "আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার চেহারা এমন সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। অবশ্যই আমার নামায ও কুরবানী এবং আমার বাঁচা ও মরা সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত। হে আল্লাহ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য হাজির।"

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾

তাদের গোশতও আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, তাদের রক্তও না। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে যায় তোমাদের তাকওয়া।[৭৩] তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্য এমনভাবে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর দেয়া পথনির্দেশনার ভিত্তিতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।[৭৪] আর হে নবী! সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

নিশ্চয়ই[৭৫] আল্লাহ ঈমানদারদের সংরক্ষণ করেন,[৭৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে পসন্দ করেন না।[৭৭]

৭১. লেগে যাওয়ার মানে শুধু এতটুক নয় যে, তারা মাটিতে পড়ে যায় বরং এ অর্থও এর অন্তরভুক্ত যে, তারা পড়ে গিয়ে স্থির হয়ে যায় অর্থাৎ তড়পানো বন্ধ করে দেয় এবং প্রাণবায়ু পুরোপুরি বের হয়ে যায়। আবু দাউদ, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে যে,

مَا قُطِعَ (اَوْ مَا بَانَ) مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

"এখনো জীবিত আছে এমন পশুর যে গোশত কেটে নেয়া হয় তা মৃত পশুর গোশত (এবং হারাম)।"

৭২. কুরবানীর হুকুম কেন দেয়া হয়েছে, এখানে আবার সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন এ কুরবানী হচ্ছে সে বিরাট নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৭৩. জাহেলিয়াতের যুগে যেমন আরববাসীরা দেবদেবীর মূর্তিদের জন্য যেসব পশু কুরবানী দিতো সেগুলো নিয়ে গিয়ে আবার তাদেরই বেদীমূলে অর্ঘ দিতো, ঠিক তেমনি আল্লাহর নামে কুরবানী দেয়া জানোয়ারের গোশত কাবাঘরের সামনে এনে রাখতো এবং রক্ত তার দেয়ালে লেপটে দিতো। তাদের মতে, এ কুরবানী যেন আল্লাহর সামনে সংশ্লিষ্ট কুরবানীর গোশত ও রক্ত পেশ করার জন্য করা হতো। এ মূর্খতার পর্দা ছিন্ন করে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর সামনে যে আসল জিনিস পেশ করা হয় তা পশুর গোশত ও রক্ত নয় বরং তোমাদের তাকওয়া।" যদি তোমরা নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খালেস নিয়তে একমাত্র আল্লাহর জন্য কুরবানী করো,

তাহলে এ প্রবণতা, নিয়ত ও আন্তরিকতার নযরানা তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে অন্যথায় রক্ত ও গোশত এখানেই থেকে যাবে। একথাই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلاَ اِلٰى اَلْوَانِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ ـ

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরাত ও ·তোমাদের রঙ দেখেন না বরং তিনি দেখেন তোমাদের মন ও কার্যকলাপ।"

৭৪. অর্থাৎ অন্তরে তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নাও এবং কাজে তার প্রকাশ ঘটাও ও ঘোষণা দাও। এরপর কুরবানীর হুকুমের উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। পশুদের ওপর আল্লাহ মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, শুধুমাত্র এ নিয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কুরবানী ওয়াজিব করা হয়নি। বরং এ জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে যে, এগুলো যাঁর পশু এবং যিনি এগুলোর ওপর আমাদের কর্তৃত্ব দান করেছেন, আমরা অন্তরে ও কাজে-কর্মেও তাঁর মালিকানা অধিকারের স্বীকৃতি দেবো, যাতে আমরা কখনো ভুল করে একথা মনে করে না বসি যে, এগুলো সবই আমাদের নিজেদের সম্পদ। কুরবানী করার সময় যে বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় তার মধ্য দিয়ে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রকাশ ঘটে। যেমন সেখানে বলা হয় اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ হে আল্লাহ ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য উপস্থিত।

এ ক্ষেত্রে একথা জেনে নেয়া উচিত যে, এ প্যারায় কুরবানীর যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র হাজীদের জন্য নয় এবং শুধুমাত্র মক্কায় হজ্জের সময় কুরবানী করার জন্য নয় বরং প্রত্যেক সমর্থ মুসলমান যেখানেই সে থাকুক না কেন তার জন্য ব্যাপকভাবে এ হুকুম দেয়া হয়েছে, যাতে সে পশুদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন করতে এবং এই সংগে নিজের স্থানে হাজীদের অবস্থার সাথে শরীক হয়ে যেতেও পারে। হজ্জ সম্পাদন করার সৌভাগ্য না হলেও কমপক্ষে হজ্জের দিনগুলোতে আল্লাহর ঘরের সাথে জড়িত হয়ে হাজীগণ যেসব কাজ করতে থাকেন সারা দুনিয়ার মুসলমানরা সেসব কাজ করতে থাকবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

এছাড়াও অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানের সমগ্র সময়ে নিজেই প্রত্যেক বছর বকরা ঈদের সময় কুরবানী করতেন এবং তাঁরই সুন্নত থেকে মুসলমানদের মধ্যে এ পদ্ধতির প্রচলন হয়। মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরাইরার (রা) এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

"যে ব্যক্তি সামর্থ রাখার পরও কুরবানী করে না তার আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছে না আসা উচিত।"

এ হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ শুধুমাত্র রেওয়ায়াতটির মারফূ' (অর্থাৎ যার বর্ণনার ধারাবাহিকতা সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে) অথবা মওকূপ (যার বর্ণনার ধারাবাহিকতা সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে) হবার ব্যাপারে দ্বিতমত ব্যক্ত করেছেন। (হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো মতভেদ হয়নি) তিরমিযীতে ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَقَامَ رَسُوْلُ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّىْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় দশ বছর থাকেন এবং প্রত্যেক বছর কুরবানী করতে থাকেন।"

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكَهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ-

"যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো তার আবার কুরবানী করা উচিত। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে কুরবানী করে তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে এবং সে মুসলমানদের পথ পেয়ে গেছে।"

আর একথা সবার জানা যে, কুরবানীর দিন মক্কায় এমন কোনো নামায হতো না যার পূর্বে কুরবানী করা মুসলমানদের সুন্নাতের বিরোধী হতো এবং পরে করা হতো তার অনুকূল। কাজেই নিশ্চিতরূপেই এ উক্তি হজ্জের সময় মক্কায় নয় বরং মদীনায় করা হয়।

মুসলিমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বকরা ঈদের নামায পড়ান এবং কোনো কোনো লোক তিনি কুরবানী করে ফেলেছেন মনে করে নিজেদের কুরবানী করে বসে। এ অবস্থা দেখে তিনি হুকুম দেন, যারা আমার পূর্বে কুরবানী করেছে তাদের আবার কুরবানী করতে হবে।

কাজেই একথা সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের উর্ধে যে, বকরা ঈদের দিন সাধারণ মুসলমানরা সারা দুনিয়ায় যে কুরবানী করে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত সুন্নাত। তবে এখানে এ কুরবানী ওয়াজিব অথবা শুধুমাত্র সুন্নাত নিছক এ বিষয়েই মতবিরোধ দেখা যায়। ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম মুহাম্মাদ এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফও একে ওয়াজিব মনে করতেন। কিন্তু ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের সুন্নাত। সুফিয়ান সাওরীও বলতেন, কেউ কুরবানী না দিলে কোনো ক্ষতি নেই। তবুও উম্মতে মুসলিমার কোনো একজন আলেমও একথা বলেন না যে, মুসলমানরা একমত হয়ে যদি তা পরিহার করে তবুও কোনো ক্ষতি নেই। এ নতুন কথা

শুধুমাত্র আমাদের যুগের কোনো কোনো লোকের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন যাদের জন্য নিজের প্রবৃত্তিই কুরআন এবং প্রবৃত্তিই সুন্নাত।

৭৫. এখান থেকে অন্য একটি বিষয়বস্তুর দিকে ভাষণটির মোড় ফিরে গেছে। প্রাসংগিক বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য একথা স্মরণ করা দরকার যে, এটি এমন এক সময়ের ভাষণ যখন হিজরতের পর প্রথমবার হজ্জের মওসুম এসেছিল। সে সময় একদিকে মুহাজির ও মদীনার আনসারদের কাছে এ বিষয়টি বড়ই কঠিন মনে হচ্ছিল যে, তাদেরকে হজ্জের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং হারম শরীফের যিয়ারতের পথ জোরপূর্বক তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মক্কায় মুসলমানদের ওপর যেসব জুলুম করা হয়েছিল শুধুমাত্র সেগুলোর আঘাতই তাদের মনে দগদগ করছিল তাই নয় বরং এ ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত শোকাহত ছিল যে, ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছে এরপর এখন মদীনাতেও তাদেরকে নিশ্চিন্তে বাস করতে দেয়া হচ্ছে না। এ সময় যে ভাষণ দেয়া হয় তার প্রথম অংশে কাবাগৃহ নির্মাণ, হজ্জ পালন ও কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একথা বলা হয় যে, এসব বিষয়ের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং জাহেলীয়াত এগুলোকে বিকৃত করে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছে। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প নিয়ে নয় বরং সংস্কারের সংকল্প নিয়ে এ অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য এগিয়ে আসার প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া এ সংগে মদীনায় কুরবানীর পদ্ধতি জারি করে মুসলমানদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয় যে, হজ্জের সময় নিজ নিজ গৃহেই কুরবানী করে শত্রুরা তাদেরকে যে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে তাতে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। আবার হজ্জ থেকে আলাদাভাবে কুরবানীকে একটি স্বতন্ত্র সুন্নাত হিসেবে জারী করে। এর ফলে যারা হজ্জ করার সুযোগ পাবে না তারাও আল্লাহর এ নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার হক আদায় করতে পারবে। এরপর এখন দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদেরকে তাদের ওপর যে জুলুম করা হয়েছিল এবং যে জুলুমের ধারা অব্যাহত ছিল তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে।

৭৬. মূলে مدافعت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর উৎপত্তি হয়েছে دفع থেকে। এ শব্দটির আসল মানে হচ্ছে, কোনো জিনিসকে হটিয়ে দেয়া ও সরিয়ে দেয়া। কিন্তু যখন "দফা" করার পরিবর্তে "মুদাফা'আত" করার কথা বলা হবে তখন এর মধ্যে আরো দুটি অর্থ শামিল হয়ে যাবে। এক, কোনো শত্রুশক্তি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং প্রতিরক্ষাকারী তার মোকাবিলা করছে। দুই, এ মোকাবিলা শুধুমাত্র একবারেই শেষ হয়ে যায়নি বরং যখনই আক্রমণকারী আক্রমণ করে তখনই এ প্রতিরক্ষাকারী তার মোকাবিলা করে। এ দুটি অর্থ সামনে রেখে বিচার করলে মু'মিনদের পক্ষ থেকে আল্লাহর "মুদাফা'আত" করার অর্থ এই বুঝা যায় যে, কুফর ও ঈমানের সংঘাতে মুমিনরা একা ও নিসংগ হয় না বরং আল্লাহ নিজেই তাদের সাথে এক পক্ষ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাদেরকে সমর্থন দান করেন। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। অনিষ্টকারকদের অনিষ্টকে তাদের থেকে দূরে সারিয়ে দিতে থাকেন। কাজেই এ আয়াতটি আসলে হকপন্থীদের জন্য একটি বড় রকমের সুসংবাদ। তাদের মনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোনো জিনিস হতে পারে না।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

৬ রুকূ’

অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা মযলুম[৭৮] এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।[৭৯] তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে[৮০] শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের রব।"[৮১] যদি আল্লাহ লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশী করে উচ্চারণ করা হয় সেসব আশ্রম, গীর্জা, ইবাদাতখানা[৮২] ও মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হতো।[৮৩] আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে।[৮৪] আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে।[৮৫] আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।[৮৬]

৭৭. এ সংঘাতে আল্লাহ কেন হকপন্থীদের সাথে একটি পক্ষ হন এটি হচ্ছে তার কারণ। এর কারণ হচ্ছে, হকের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত দ্বিতীয় পক্ষটি বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারী। আল্লাহ তার কাছে যেসব আমানত সোপর্দ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে সে খেয়ানত করেছে এবং তাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি ও নেমকহারামির মাধ্যমে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়ে চলছে। কাজেই আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হক-পন্থীদেরকে সাহায্য-সহায়তা দান করেন।

৭৮. যেমন ইতোপূর্বে ভূমিকায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ এটিই প্রথম আয়াত। এ আয়াতে কেবলমাত্র অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পরে সূরা বাকারায় যুদ্ধের আদেশ প্রদান সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয়। অর্থাৎ

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ـ (ايت : ١٩٠)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ ـ (ايت : ١٩١)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ـ (ايت : ١٩٣)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ـ (ايت : ٢١٦)

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ (ايت : ٢٤٤)

অনুমতি ও হুকুম দেয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অনুমতি নাযিল হয় হিজরীর প্রথম বছরের যিলহজ্জ মাসে এবং হুকুম নাযিল হয় বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শাবান মাসে।

৭৯. অর্থাৎ এরা মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এ সত্ত্বেও আল্লাহ এদেরকে আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের ওপর বিজয়ী করতে পারেন। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যখন এ অস্ত্রধারণ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছিল তখন মুসলমানদের সমস্ত শক্তি কেবলমাত্র মদীনার একটি মামুলি ছোট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় মুহাজির ও আনসারদের মিলিত শক্তি সর্বসাকুল্যে এক হাজারও ছিল না। এ অবস্থায় কুরাইশদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল। আর কুরাইশরা একা ছিল না বরং আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রগুলোও তাদের পেছনে ছিল। পরে ইহুদীরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। এসময় "আল্লাহ অবশ্য তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে" একথা বলা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। এর ফলে এমনসব মুসলমানদের মনেও সাহসের সঞ্চার হয়েছে যাদেরকে সমগ্র আরব শক্তির বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে মোকাবিলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং কাফেরদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই মর্মে যে, তোমাদের মোকাবিলা আসলে আল্লাহর সাথে, ঐ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সাথে নয়। কাজেই যদি আল্লাহর মোকাবিলা করার সাহস থাকে তাহলে সামনে এসো।

৮০. এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা হজ্জের এ অংশটি অবশ্যই হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে।

৮১. এদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার করে বের করে দেয়া হয় তা অনুমান করার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা সামনে রাখতে হবে ঃ

হযরত সোহাইব রুমী (রা) যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশ বংশীয় কাফেররা তাঁকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছো।

যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। কারো দান তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু ঐ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরনের কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও তাঁর স্বামী আবু সালামাহ (রা) নিজেদের দুধের বাচ্চাটিকে নিয়ে হিজরত করার জন্য বের হয়ে পড়েন, বনী মুগীরাহ (উম্মে সালামাহর পরিবারের লোকেরা) তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারা আবু সালামাহকে বলে, তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো কিন্তু আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে পারো না। বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রীকে রেখে দিয়ে চলে যান। এরপর বনী আবদুল আসাদ (আবু সালামাহর বংশের লোকেরা) এগিয়ে আসে এবং তারা বলে, শিশুটি আমাদের গোত্রের, তাকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও, এভাবে মা ও বাপ উভয়ের কাছ থেকে শিশু সন্তানকেও ছিনিয়ে নেয়া হয়, প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত উম্মে সালামাহ (রা) স্বামী ও সন্তানের শোকে ছটফট করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বড়ই কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে নিজের শিশু সন্তানটি পুনরুদ্ধার করে মক্কা থেকে এমন অবস্থায় বের হয়ে পড়েন যে, একজন নিসংগ স্ত্রীলোক কোলে একটি ছোট বাচ্চা নিয়ে উটের পিঠে বসে আছেন। এমন পথ দিয়ে তিনি চলছেন যেখান দিয়ে সশস্ত্র কাফেলা যেতে ভয় পেতো।

আইয়াশ ইবনে রাবীআহ আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। হযরত উমরের (রা) সাথে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে যান, পিছে পিছে আবু জেহেল নিজের এক ভাইকে সংগে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়। সে মায়ের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে, আম্মাজান কসম খেয়েছেন আইয়াশের চেহারা না দেখা পর্যন্ত রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না এবং মাথায় চিরুনীও লাগাবেন না। কাজেই তুমি গিয়ে একবার শুধু তাকে চেহারা দেখিয়ে দাও তারপর চলে এসো। তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মাতৃভক্তির আতিশয্যে তাদের সংগ নেন। পথে দুই ভাই মিলে তাকে বন্দী করে এবং তাকে নিয়ে মক্কায় এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যখন তার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি বাঁধা ছিল এবং দুই ভাই চিৎকার করে যাচ্ছিল, "হে মক্কাবাসীরা ! নিজেদের নালায়েক ছেলেদেরকে এমনিভাবে শায়েস্তা করো যেমন আমরা করেছি।" দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি বন্দী থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন দুঃসাহসী মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকে এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও জালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি।

৮২. মূলে صَوَامِعُ، بِيَعٌ ও صَلَوَاتٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। صومعة এমন জায়গাকে বলা হয় যেখানে খৃষ্টান রাহেব, যোগী, সন্ন্যাসী, সংসার বিরাগী সাধুরা থাকেন। "بيعة" শব্দটি আরবী ভাষায় খৃষ্টানদের ইবাদাতগাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। "صلوات" শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের নামায পড়ার জায়গা। ইহুদীরা নিজেদের ভাষায় একে বলে صلوتا "সলওয়াতা"। এটি আরামীয় ভাষার শব্দ। বিচিত্র নয় যে,

ইংরেজী ভাষার Salute ও Salutation শব্দ এর থেকে বের হয়ে প্রথম ল্যাটিন ও পরে ইংরেজী ভাষায় পৌছে গেছে।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ কোনো একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি, এটি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ায় একটি দলকে দিয়ে তিনি অন্য একটি দলকে প্রতিহত করতে থেকেছেন। নয়তো কোনো একটি নির্দিষ্ট দল যদি কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করতো তাহলে শুধু দুর্গ, প্রাসাদ এবং রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস করে দেয়া হতো না বরং ইবাদাতগাহগুলোও বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতো না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুকে এভাবে বল হয়েছে ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

"যদি আল্লাহ লোকদেরকে একজনের সাহায্যে অন্যজনকে প্রতিহত না করতে থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়।" (২৫১ আয়াত)

৮৪. এ বক্তব্যটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে, বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং সত্য দীন কায়েম ও মন্দের জায়গায় ভালোকে বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালায় তারা আসলে আল্লাহর সাহায্যকারী। কারণ, এটি আল্লাহর কাজ। এ কাজটি করার জন্য তারা আল্লাহর সাথে সহযোগিতা করে। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা আলে ইমরান ৫০ টীকা।

৮৫. অর্থাৎ আল্লাহকে সাহায্যকারী এবং তাঁর সাহায্য ও সহায়তালাভের অধিকারী লোকদের গুণাবলী হচ্ছে এই যে, যদি দুনিয়ায় তাদেরকে রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে তারা ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হবার পরিবর্তে নামায কায়েম করবে। তাদের ধন-সম্পদ, বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত দানে ব্যয়িত হবে। তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সৎকাজকে দাবিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব সম্পন্ন করবে। তাদের শক্তি অসৎকাজকে ছড়াবার পরিবর্তে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। এ একটি বাক্যের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ এবং তার কর্মী ও কর্মকর্তাদের বৈশিষ্টের নির্যাস বের করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি বুঝতে চায় ইসলামী রাষ্ট্র আসলে কোন জিনিসের নাম তাহলে এ একটি বাক্য থেকেই তা বুঝে নিতে পারে।

৮৬. অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কোন সময় কার হাতে সোপর্দ করতে হবে এ ব্যাপারটির সিদ্ধান্ত আল্লাহ নিজেই নেন। অহংকারী বান্দারা এ ভুল ধারণা করে যে, পৃথিবীতে বসবাসকারীদের ভাগ্যের ফায়সালা তারা নিজেরাই করে। কিন্তু যে শক্তি একটি ছোট্ট বীজকে বিশাল বৃক্ষে এবং একটি বিশাল বৃক্ষকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত করে তার মধ্যেই এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, যাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দেখে লোকেরা মনে করে

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

হে নবী! যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে,[৮৭] তাহলে ইতিপূর্বে নূহের জাতি, আদ, সামূদ, ইবরাহীমের জাতি, লূতের জাতি ও মাদয়ানবাসীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং মূসার প্রতিও মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। এসব সত্য অস্বীকারকারীকে আমি প্রথমে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি।[৮৮] এখন দেখে নাও আমার শাস্তি কেমন ছিল।[৮৯] কত দুষ্কৃতকারী জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং আজ তারা নিজেদের ছাদের ওপর উলটে পড়ে আছে, কত কূয়া[৯০] অচল এবং কত প্রাসাদ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে।

এদেরকে নড়াবার সাধ্য কারো নেই, তাদেরকে তিনি এমনিভাবে ভূপাতিত করেন যে, সারা দুনিয়াবাসীর জন্য শিক্ষণীয় হয় এবং যাদেরকে দেখে কেউ কোনোদিন ধারণাই করতে পারে না যে, এরাও কোনোদিন উঠে দাঁড়াবে তাদের মাথা তিনি এমনভাবে উঁচু করে দেন যে, দুনিয়ায় তাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজতে থাকে।

৮৭. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা।

৮৮. অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো জাতিকেও নবীকে অস্বীকার করার সাথে সাথেই পাকড়াও করা হয়নি। বরং প্রত্যেককে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া হয়। তাদেরকে তখনই পাকড়াও করা হয় যখন ইনসাফের দাবী পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় মক্কার কাফেররা যেন তাদের দুর্ভাগ্য আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে নবীর সতর্কবাণীগুলোকে নিছক অন্তসারশূন্য হুমকি মনে না করে। মূলত এভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আল্লাহ তাঁর রীতি অনুযায়ী তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এ অবকাশের সুযোগ যদি তারা যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তাহলে তাদের পরিণামও তাই হবে যা তাদের পূর্ববর্তীদের হয়েছে।

৮৯. মূলে نَكِيْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্তি বা অন্য কোনো শব্দের মাধ্যমে এর পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায় না। এ শব্দের দুটি অর্থ হয়। এক, কোনো ব্যক্তির খারাপ মনোভাব ও মন্দ নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা। দুই, তাকে এমন শাস্তি দেয়া যার

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি, যার ফলে তারা উপলব্ধিকারী হৃদয় ও শ্রবণকারী কানের অধিকারী হতো ? আসল ব্যাপার হচ্ছে, চোখ অন্ধ হয় না বরং হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়, যা বুকের মধ্যে আছে।[৯১]

তারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়ো করছে[৯২] *আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের কাছের একটি দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়।*[৯৩] *কতই জনপদ ছিল দুরাচার, আমি প্রথমে তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি তারপর পাকড়াও করেছি। আর সবাইকে তো ফিরে আমারই কাছে আসতে হবে।*

ফলে তার অবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়, চেহারা এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায় যেন কেউ দেখে তাকে চিনতে না পারে। এ দুটি অর্থের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, "এখন দেখে নাও, তাদের এ নীতির কারণে যখন আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হলো তখন আমি তাদের অবস্থা পরিবর্তিত করে দিলাম।"

৯০. আরবে কূয়া ও জনবসতি প্রায় সমার্থক শব্দ। কোনো গোত্রের জনবসতির নাম নিতে হলে বলা হয় ماء بنى فلان অর্থাৎ অমুক গোত্রের কূয়া। একজন আরবের সামনে যখন বলা হবে কূয়াগুলো অকেজো পড়ে আছে তখন সে এর অর্থ এ বুঝবে যে জনবসতিগুলো জনশূণ্য ও পরিত্যক্ত।

৯১. মনে রাখতে হবে, কুরআন বিজ্ঞানের বই নয় বরং সাহিত্যের ভাষায় কথা বলে। এখানে অযথা এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই যে, বক্ষস্থিত হৃদয় আবার চিন্তা করে কবে থেকে ? সাহিত্যের ভাষায় আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা বরং প্রায় সবরকমের কাজকেই মস্তিষ্ক, বক্ষদেশ ও হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এমনকি কোনো কথা মনে থাকার ব্যাপারটিও এভাবে বলা হয়, "সেটা তো আমার বুকে সংরক্ষিত আছে।"

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا۟ فِىٓ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

৭ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "ওহে লোকেরা! আমি তো তোমাদের জন্য শুধুমাত্র (খারাপ সময় আসার আগেই) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৯৪] *কাজেই যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক জীবিকা।*[৯৫] *আর যারা আমার আয়াতকে খাটো করার চেষ্টা করবে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।*

আর হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি এমন কোনো রাসূল ও নবী পাঠাইনি[৯৬] *(যার সাথে এমন ঘটনা ঘটেনি যে) যখন সে তামান্না করেছে।*[৯৭] *শয়তান তার তামান্নায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।*[৯৮] *এভাবে শয়তান যাকিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করে আল্লাহ তা দূর করে দেন এবং নিজের আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন,*[৯৯] *আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।*[১০০]

৯২. অর্থাৎ বারবার চ্যালেঞ্জ করছে। তারা বলছে যদি তুমি সাচ্চা নবী হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর সত্য নবীকে অস্বীকার করার ফলে যে আযাব আসা উচিত এবং যার ব্যাপারে তুমি বারবার হুমকি দিয়েছো তা আসছে না কেন ?

৯৩. অর্থাৎ মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের সময় নির্ধারক ও পঞ্জিকার হিসেব অনুযায়ী হয় না। যেমন আজকে একটি ভুল বা সঠিক নীতি অবলম্বন করা হলো এবং কালই তার মন্দ বা ভালো ফলাফল প্রকাশ হয়ে গেলো, এমন নয়। কোনো জাতিকে বলা হয়, অমুক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ফল দাঁড়াবে তোমাদের ধ্বংস। এর জবাবে তারা যদি এ যুক্তি পেশ করে যে, এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার পর আমাদের দশ বিশ-পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখনো তো আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তাহলে

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۝ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

*(তিনি এজন্য এমনটি হতে দেন) যাতে শয়তানের নিক্ষিপ্ত অনিষ্টকে পরীক্ষায় পরিণত করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে এবং যাদের হৃদয়বৃত্তি মিথ্যা-কলুষিত— আসলে এ যালেমরা শত্রুতায় অনেক দূরে পৌঁছে গেছে— এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জেনে নেয় যে, তোমার রবের পক্ষ থেকে এটা সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে ; যারা ঈমান আনে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন।*১০১

তারা হবে বড়ই নির্বোধ। ঐতিহাসিক ফলাফলের জন্য দিন, মাস ও বছর তো সামান্য ব্যাপার, শতাব্দীও কোনো বিরাট ব্যাপার নয়।

৯৪. আমি তোমাদের ভাগ্য নির্ণায়ক নই বরং একজন সতর্ককারী মাত্র। সর্বনাশ ঘটার আগে তোমাদের সতর্ক করে দেয়াই আমার কাজ এর বেশী কোনো দায়িত্ব আমার ওপর নেই। পরবর্তী ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন কাকে কতদিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন এবং কবে কোন অবস্থায় শাস্তি দেবেন।

৯৫. "মাগফেরাত" বলতে বুঝানো হয়েছে অপরাধ, পাপ, ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে চলা। আর "সম্মানজনক জীবিকা"র দু'টি অর্থ হয়। প্রথমত উত্তম জীবিকা দেয়া এবং দ্বিতীয়ত মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত করে জীবিকা দেয়া।

৯৬. রসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটির ব্যাখ্যা সূরা মারয়ামের ৩০ টীকায় আলোচিত হয়েছে।

৯৭. মূল শব্দটি হচ্ছে, تَمَنّٰى (তামান্না)। আরবী ভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসের আশা-আকাংখা করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তেলাওয়াত অর্থাৎ কিছু পাঠ করা।

৯৮. "তামান্না" শব্দটি যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, শয়তান ও তার আকাংখা পূর্ণ হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করলে এর অর্থ

হবে, যখনই তিনি লোকদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়েছেন তখনই শয়তান সে সম্পর্কে লোকদের মনে নানা সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে, সেগুলোর অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ তাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং একমাত্র সঠিক অর্থটি ছাড়া বাকি সব ধরনের উল্টা-পাল্টা অর্থ লোকদেরকে বুঝিয়েছে।

৯৯. প্রথম অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হবে এই যে, আল্লাহ শয়তানের বিঘ্ন সৃষ্টি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নবীর তামান্না তথা আশা-আকাংখা (আর নবীর আশা-আকাংখা এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী এবং মিশন বাস্তবায়িত হবে) পূর্ণ করেন এবং নিজের আয়াতকে (অর্থাৎ নবীর সাথে তিনি যেসব অংগীকার করেছিলেন) পাকাপোক্ত ও মজবুত অংগীকারে পরিণত করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হবে, শয়তানের ঢুকানো সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি আল্লাহ দূর করে দেন এবং এক একটি আয়াত সম্পর্কে সে লোকদের মনে যেসব জটিলতা সৃষ্টি করে পরবর্তী কোনো অধিকতর সুস্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে সেগুলো পরিষ্কার করে দেয়া হয়।

১০০. অর্থাৎ তিনি জানেন শয়তান কোথায় কি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং তার কি প্রভাব পড়েছে. তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শয়তানী ফিতনার প্রতিবিধান করে।

১০১. অর্থাৎ শয়তানের ফিতনাবাজীকে আল্লাহ লোকদের জন্য পরীক্ষা এবং নকল থেকে আসলকে আলাদা করার একটা মাধ্যমে পরিণত করেছেন। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা এসব জিনিস থেকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এগুলো তাদের জন্য ভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত হয়. অন্যদিকে স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী লোকেরা এসব কথা থেকে নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্য হবার দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে এবং তারা অনুভব করতে থাকে যে, এগুলো শয়তানের অনিষ্টকর কার্যকলাপ। এ জিনিসটি তাদেরকে একদম নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, এটি নির্ঘাত কল্যাণ ও সত্যের দাওয়াত, নয়তো শয়তান এতে এতো বেশী অস্থির হয়ে পড়তো না।

বক্তব্য পরম্পরা সামনে রাখলে এ আয়াতগুলোর অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এ সময় যে পর্যায়ে ছিল তা দেখে বাহ্যজ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করছিল তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন। সাধারণ দর্শকরা এটাই দেখছিল যে, এক ব্যক্তির বিপুল আকাংখা ছিল। তিনি আশা করছিলেন তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তের বছর ধরে নাউযুবিল্লাহ অনেক মাথা খোড়ার পর তিনি শেষমেষ নিজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সংগী সাথী নিয়ে প্রিয় স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হলেন. এ অবস্থায় লোকেরা যখন তাঁর এ বক্তব্য দেখতো যেখানে তিনি বলছেন, আমি আল্লাহর নবী এবং তিনি আমাকে সাহায্য-সহায়তা দান করছেন আর এ সংগে কুরআনের এ ঘোষণাবলীও দেখতো, যাতে বলা হয়েছে, নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী জাতি আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয় তখন তাদের কাছে তাঁর ও কুরআনের সত্যতা সংশয়িত হয়ে যেতো। তাঁর বিরোধীরা এর ফলে গায়ে পড়ে নানা কথা বলতো। তারা বলতো, কোথায় গেলো সে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা ? কি হলো সে শাস্তির ভয় দেখাবার ? আমাদের যে আযাবের ভয় দেখানো হতো তা এখন আসে না কেন ? এর আগের আয়াতগুলোতে এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছিল। এবং এরি জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আগের আয়াতগুলোতে জবাবের লক্ষ ছিল

কাফেরা এবং এ আয়াতগুলোতে এর লক্ষ হচ্ছে এমন সব লোক যারা কাফেরদের প্রচারণায় প্রভাবিত হচ্ছিল। সমগ্র জবাবের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ

"কোনো জাতি কর্তৃক তার নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার ব্যাপারটি ইতিহাসে কোনো নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বেও এমনটিই হয়েছে। তারপর এ মিথ্যা আরোপের পরিণামও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আকারে তোমাদের সামনে রয়েছে। শিক্ষা নিতে চাইলে এ থেকে নিতে পারো। তবে মিথ্যা আরোপ এবং নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার সাথে সাথেই কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তা শুরু হয়ে যায়নি কেন, এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, প্রত্যেকটি প্রত্যাখ্যান সংগে সংগেই আযাব নিয়ে আসে একথা কবে বলা হয়েছিল ? আর আযাব নিয়ে আসা নবীর নিজের কাজ এ কথাইবা তিনি কবে বলেছিলেন ? এর ফায়সালা তো আল্লাহ নিজেই করেন এবং তিনি তাড়াহুড়ো করে কাজ করেন না। ইতিপূর্বেও তিনি আযাব নাযিল করার আগে জাতিগুলোকে অবকাশ দিয়ে এসেছেন এবং এখনো দিচ্ছেন। এ অবকাশকাল যদি শত শত বছর পর্যন্তও দীর্ঘ হয় তাহলে এ থেকে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আযাব নাযিলের হুমকি দেয়া হয়েছিল তা অন্তরসারশূন্য প্রমাণিত হয় না।

তারপর নবীর আশা-আকাংখা পূর্ণ হবার পথে বাধার সৃষ্টি হওয়া বা তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ এবং বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ-সংশয়-আপত্তির প্রবল ঝড় সৃষ্টি হওয়াও কোনো নতুন কথা নয়। পূর্বে সকল নবীর দাওয়াতের মোকাবিলায় এসব কিছুই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ এসব শয়তানী ফিতনার মূলোচ্ছেদ করেছেন। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সত্যের দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়েছে। সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত আয়াতের মাধ্যমে সন্দেহ-সংশয়ের বিঘ্ন দূরীভূত হয়েছে। শয়তান ও তার সাংগ পাংগরা এসব কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর আয়াতকে মর্যাদাহীন করতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সেগুলোকেই মানুষের মধ্যে আসল ও নকলের পার্থক্য করার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। এ পথেই আসল ও নির্ভেজাল মানুষেরা সত্যের দাওয়াতের দিকে এগিয়ে আসে এবং ভেজাল ও মেকী লোকেরা ছাটাই হয়ে আলাদা হয়ে যায়।"

পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে এ হচ্ছে এ আয়াতগুলোর পরিষ্কার ও সহজ সরল অর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি রেওয়ায়াত এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার মধ্যে এমন জটিলতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যার ফলে কেবল এদের অর্থেরই আমূল পরিবর্তন ঘটেনি বরং সমগ্র দীনের বুনিয়াদই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এখানে আমি এর আলোচনা এজন্য করছি যে, কুরআনের জ্ঞানানুশীলনকারীকে অবশ্যই কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে রেওয়ায়াতের সাহায্য গ্রহণ করার সঠিক ও বেঠিক পদ্ধতিগুলোর পার্থক্য ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং তাদের জানতে হবে রেওয়ায়াতের প্রতি মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অবৈধ বাড়াবাড়ির ফল কি হয় এবং কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদানকারী রেওয়ায়াত যাচাই করার সঠিক পদ্ধতি কি।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে আকাংখা জাগে, আহা, যদি কুরআনে এমন কোনো আয়াত নাযিল হতো যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের ঘৃণা দূর হয়ে যেতো এবং তারা কিছুটা

কাছাকাছি এসে যেতো। অথবা কমপক্ষে তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে এমন কড়া সমালোচনা না হতো যা তাদেরকে উত্তেজিত করে, এ আকাংখা তাঁর মনের মধ্যেই ছিল এমন সময় একদিন কুরাইশদের একটি বড় মজলিসে বসে থাকা অবস্থায় তাঁর ওপর সূরা নজম নাযিল হয় এবং তিনি তা পড়তে শুরু করেন। যখন তিনি أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى আয়াতে পৌঁছেন তখন হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে নাকি বের হয়ে যায় ঃ تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترجى এরা সব মহিয়সী দেবী, এদের সুপারিশ অবশ্যই কাংখিত। এরপর তিনি সামনের দিকে সূরা নজমের আয়াতগুলো পড়ে যেতে থাকেন। এমনকি সূরা শেষে যখন তিনি সিজদা করেন তখন মুশরিক মুসলিম নির্বিশেষে সবাই সিজদা করে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতে থাকে, এখন আর মুহাম্মাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরাও তো একথাই বলতাম, আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা আর আমাদের এ দেবদেবীরা তাঁর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। সন্ধ্যায় জিব্রীল আসেন। তিনি বলেন, এ আপনি কি করলেন? এ দু'টি বাক্য তো আমি নিয়ে আসিনি। এতে তিনি বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন তখন মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ রুকূর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ
...... ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

এ বিষয়টি সব সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে রাখে। শেষে সূরা হজ্জের এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, তোমার পূর্বেও নবীদের সাথে এমনিতর ঘটনা ঘটতে থেকেছে। ওদিকে কুরআন শুনে কুরাইশের লোকেরাও নবীর (স) সাথে সিজদা করেছে এ ঘটনাটি হাবশার মুহাজিরদের কাছেও এভাবে পৌঁছে যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কার কাফেরদের সমঝোতা হয়ে গেছে তাই বহু মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে এসে তারা জানতে পারেন সমঝোতা ও সন্ধির খবরটি ভুল ছিল, ইসলাম ও কুফরের শত্রুতা আগের মতই অপরিবর্তিত আছে

এ ঘটনাটি ইবনে জারীর ও অন্যান্য বহু তাফসীরকার নিজেদের তাফসীর গ্রন্থে, ইবনে সা'দ তাবকাতে আল ওয়াহেদী, আসবাবুন নুযুলে, মূসা ইবনে উকবাহ মাগাযীতে- ইবনে ইসহাক সীরাতে এবং ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, বাযযার, ইবনে মারদুইয়া ও তাবারানী নিজেদের হাদীস সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন। যেসব বর্ণনা পরম্পরায় এ ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস, মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরযী, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, আবু সালেহ, আবুল আলীয়াহ, সা'ঈদ ইবনে জুবাইর, দ্বাহহাক, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস, কাতাদাহ, মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবনে শিহাব, যুহরী ও ইবনে আব্বাস পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। উল্লেখ্য ইবনে আব্বাস ছাড়া এদের মধ্যে আর একজনও সাহাবী নেই। ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে সামান্য ছোট-খাটো বিরোধ ও অসামঞ্জস্য বাদ দিলেও দু'টি বড় বড় বিরোধ দেখা যায়। একটি হচ্ছে, মূর্তির

প্রশংসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব শব্দ বেরিয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রায় প্রত্যেক বর্ণনায় অন্য বর্ণনা থেকে আলাদা। আমি এগুলো একত্র করার চেষ্টা করেছি। ফলে পনেরটি ইবারতে আলাদা আলাদা শব্দ পেয়েছি। দ্বিতীয় বড় বিরোধটি হচ্ছে, কোন্ বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ শব্দগুলো অহীর মাঝখানে শয়তান তাঁর মনে ঢুকিয়ে দেয় এবং তিনি মনে করেন এও বুঝি জিব্রীল এনেছেন। কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ শব্দগুলো নিজের পূর্বের বাসনার প্রভাবে ভুলক্রমে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে গেছে। কোনোটায় বলা হয়েছে, সে সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং এ অবস্থায় এ শব্দগুলো তাঁর কণ্ঠ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। কারোর বর্ণনা হচ্ছে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একথা বলেন এবং অস্বীকারমূলক জিজ্ঞাসা হিসেবেই বলেন। কারো বক্তব্য হচ্ছে, শয়তান তাঁর আওয়াজের সাথে আওয়াজ মিলিয়ে এ শব্দগুলো বলে দেয় এবং মনে করা হয় তিনি এগুলো বলেছেন। আবার কারো মতে মুশরিকদের মধ্যে থেকে কেউ একথা বলে।

ইবনে কাসীর, বাইহাকী, কাযী আইয়ায, ইবনে খুযাইমা, কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী, ইমাম রাযী, করতুবী, বদরুদ্দীন আইনী, শাওকানী, আল্লামা আলূসী প্রমুখ মহোদয়গণ এ ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা গণ্য করেন। ইবনে কাসীর বলেন, "যতগুলো সনদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলোই মুরসাল[১] ও মুনকাতে[২]। কোনো সহীহ মুত্তাসিল[৩] সনদের মাধ্যমে এ হাদীসটি আমি পাইনি।" বাইহাকী বলেন, "হাদীস বিচারের যথার্থ পদ্ধতিতে এ ঘটনাটি প্রমাণিত নয়।" ইবনে খুযাইমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তাতে তিনি বলেন, "এটি যিনদিকদের (যরোথুস্ট্রীয়পন্থী নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী) তৈরি করা।" কাযী আইয়ায বলেন, "এর দুর্বলতা এখান থেকেই সুস্পষ্ট যে, সিহাহে সিত্তার[৪] লেখকদের একজনও নিজের গ্রন্থে একে স্থান দেননি এবং কোনো সহীহ মুত্তাসিল ত্রুটিমুক্ত সনদ সহকারে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমেও এটি উদ্ধৃত হয়নি।" ইমাম রাযী, কাযী আবু বকর ও আলূসী এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করে শক্তিশালী যুক্তির ভিত্তিতে একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু অন্যদিকে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর মতো উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস, আবু বকর জাস্সাসের ন্যায় খ্যাতিমান ফকীহ, যামাখশারীর মতো যুক্তিবাদী মুফাসসির এবং ইবনে জারীরের ন্যায় তাফসীর, ইতিহাস ও ফিকাহর ইমাম একে সহীহ বলে স্বীকার করেন এবং একেই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা গণ্য করেন। ইবনে হাজারের মুহাদ্দিস সুলভ যুক্তি হচ্ছে ঃ

১. মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের শেষের দিকে তাবেঈর পরে কোনো রাবী নেই এবং তাবেঈ নিজেই বলেছেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন।"

২. মুনকাতে ঃ যে হাদীসের কোনো স্তরে এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়।

৩. মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের কোনো স্তরে কোনো রাবী বাদ পড়েনি এবং সকল রাবীর নাম যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

৪. সিহাহে সিত্তা ঃ ছয়টি সহীহ তথা নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ যেমন, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

"সাঈদ ইবনে জুবাইরের মাধ্যম ছাড়া বাকি অন্যান্য যেসব মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা হয় যঈফ[৫] আর নয়তো মুনকাতে।" কিন্তু মাধ্যমের সংখ্যাধিক্য একথা প্রকাশ করে যে, এর নিশ্চয়ই কোন মূল আছে। এছাড়াও এটি একটি মাধ্যমে মুত্তাসিল পদ্ধতিতে সহীহ সনদ সহকারেও বর্ণিত হয়েছে। বাযযার এটি উদ্ধৃত করেছেন। (এখানে ইউসুফ ইবনে হাম্মাদ-উমাইয়াহ ইবনে খালেদ থেকে, তিনি শু'বা থেকে, তিনি আবু বিশর থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটির কথা বলা হয়েছে) অন্য দুটি মাধ্যমে যদিও মুরসাল বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এর রাবীগণ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী পূর্ণ গুণ সম্পন্ন। তাবারী এ দুটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একটি উদ্ধৃত হয়েছে ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ কর্তৃক ইবনে শিহাব থেকে এবং অন্যটি মুতামির ইবনে সুলাইমান ও হাম্মাদ ইবনে সালামাহ কর্তৃক দাউদ ইবনে আবী হিন্দ থেকে এবং তিনি আবীল আলীয়াহ থেকে।"

সমর্থকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা তো এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরাও সাধারণভাবে এর বিরুদ্ধে সমালোচনার হক আদায় করেননি। একটি দল একে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাদের দৃষ্টিতে এর সনদ শক্তিশালী নয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, যদি সনদ শক্তিশালী হতো তাহলে তারা এ কাহিনীটি মেনে নিতেন। দ্বিতীয় দলটি একে এজন্য প্রত্যাখ্যান করেন যে, এর ফলে সমগ্র দীনই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় এবং দীনের প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় যে, নাজানি আরো কোথায় কোথায় শয়তানী কুমন্ত্রণা ও মিশ্রণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অথচ এ ধরনের যুক্তি তো কেবল এমনসব লোককে নিশ্চিত করতে পারে যারা আগে থেকে দৃঢ় ও পরিপক্ক ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু যারা প্রথম থেকেই সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন অথবা যারা এখন গবেষণা-অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঈমান আনা বা না আনার ফায়সালা করতে চান তাদের মনে তো যেসব জিনিসের কারণে এ দীন সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় সেগুলো প্রত্যাখ্যান করার অনুভূতি জাগতে পারে না। বরং তারা বলবেন, যখন কমপক্ষে একজন প্রখ্যাত সাহাবী এবং বহু তাবেঈ, তাবে'তাবেঈ ও অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে একটি ঘটনার প্রমাণ হচ্ছে তখন তাকে শুধুমাত্র এজন্যই বা কেন প্রত্যাখ্যান করা হবে যে, এর ফলে আপনার দীন সংশয়পূর্ণ হয়ে যায় ? এর পরিবর্তে আপনার দীনকেই বা সংশয়পূর্ণ মনে করা হবে না কেন যখন এ ঘটনাটি তাকে সংশয়পূর্ণ বলে প্রমাণ করছে।

এখন সমালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ের সঠিক পদ্ধতি চিহ্নিত করা দরকার, যার কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে এর সনদ যতই শক্তিশালী বা দুর্বল হোক না কেন একে অগ্রহণযোগ্য গণ্য করা যেতে পারে।

৫. যঈফ ঃ যে হাদীসের রাবীর মধ্যে 'আদালত' ও 'যব্ত' গুণ যে কোনো পর্যায়েই থাকে না। আদালত মানে হচ্ছে (১) তাকওয়া ও পবিত্র গুণ থাকা, (২) মিথ্যা না বলা, (৩) কবীরা গুনাহ না করা (৪) অজ্ঞাতনামা না হওয়া অর্থাৎ দোষগুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা সম্ভব হয় না এবং (৫) শরীয়াত বিরোধী আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিদআতীও নয়। অন্যদিকে 'যব্ত' হচ্ছে এমন শক্তি যার সাহায্যে মানুষ শোনা বা লিখিত বিষয়কে ভুলে যাওয়া বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে এবং ইচ্ছামতো তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে।—অনুবাদক

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ। এটি তাকে ভুল প্রমাণ করে কাহিনীটিতে বর্ণনা করা হয়েছে, হাবশায় হিজরাত সম্পন্ন হয়ে যাবার পর ঘটনাটি ঘটে এবং এই ঘটনার খবর শুনে হাবশায় হিজরাতকারীদের একটি দল মক্কায় ফিরে আসে। এবার একটু তারিখের পার্থক্য বিবেচনা করুন।

০—নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে জানা যায় হাবশায় হিজরাত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম নববী সালের রজব মাসে। আর হাবশার মুহাজিরদের একটি দল সমঝোতার ভুল খবর শুনে তিন মাস পরে (অর্থাৎ একই বছর প্রায় শওয়াল মাসে) মক্কায় ফিরে আসে। এ থেকে জানা যায়, এটি নির্ঘাত পঞ্চম নববী সনের ঘটনা।

০—সূরা বনী ইসরাঈলের একটি আয়াতের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। সূরা বনী ইসরাঈল মি'রাজের পরে নাযিল হয়। আর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, ১১ বা ১২ নববী সালে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজের পাঁচ ছয় বছর পর আল্লাহ তাঁর অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

০—আর পূর্বাপর বক্তব্যের ভিত্তিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি ১ হিজরী সনে নাযিল হয়। অর্থাৎ ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশের পরও যখন আরো দুই আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তখন ঘোষণা করা হয়, এ মিশ্রণ তো শয়তানী কুমন্ত্রণার মাধ্যমে ঘটে গিয়েছিল। আল্লাহ একে রহিত করে দিয়েছেন।

কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কি একথা মেনে নিতে পারে যে, মিশ্রণের কাজটি হলো আজ, তার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করা হলো ৬ বছর পর এবং মিশ্রণটি রহিত করার ঘোষণা হলো ৯ বছর পর ?

তারপর এ ঘটনায় বলা হয়েছে, এ মিশ্রণটি হয়েছিল সূরা নজমে এবং এভাবে হয়েছিল যে, শুরু থেকে নবী (স) আসল সূরার শব্দাবলী পাঠ করে আসছিল। হঠাৎ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى। বাক্যাংশে পৌছে তিনি নিজেই বা শয়তানী প্ররোচনায় এ বাক্য মিশিয়ে দিলেন এবং তারপর সামনের দিকে আবার সূরা নজমের আসল আয়াত পড়তে থাকলেন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, মক্কার কাফেররা এটা শুনে খুশী হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, এখন আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে বিরোধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সূরা নজমের বক্তব্য পরম্পরায় এ প্রক্ষিপ্ত বাক্যটি সংযুক্ত করে দেখুন তো কি দাঁড়ায় ঃ

> "তারপর তোমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছো এই লাত, উযযা ও তৃতীয় একটি (দেবী) মানাত সম্পর্কে ? এরা হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাশালিনী দেবী। এদের সুপারিশ অবশ্যই কাংখিত। তোমাদের জন্য হবে পুত্রগণ এবং তার (অর্থাৎ আল্লাহর) জন্য হবে কন্যাগণ ? এতো বড় অন্যায় ভাগ-বাটোয়ারা। আসলে এগুলো কিছুই নয় তবে কতিপয় নাম, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা রেখে দিয়েছে। আল্লাহ এগুলোর জন্য কোনো প্রমাণপত্র অবতীর্ণ করেননি। লোকেরা নিছক অনুমান ও মনগড়া চিন্তার অনুসরণ করে চলছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা এসে গেছে।"

দেখুন এ প্রারাগ্রাফটির মধ্যে রেখাচিহ্নিত বাক্যটির বক্তব্য কেমন পরিষ্কার বৈপরীত্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক কথায় বলে দেয়া হচ্ছে। যথার্থই তোমাদের এ দেবীগুলো উচ্চমর্যাদার অধিকারী, এদের সুপারিশ অবশ্যই আকাংখার বস্তু। অন্য কথায় উল্টা দিকে মুখ করে আবার তাদেরই ওপর আঘাত হানা হচ্ছে এই বলে যে, নির্বোধের দল! তোমরা আল্লাহর জন্য এ মেয়েদেরকে কেমন করে ঠিক করে রাখলে ? ধাপ্পা তো মন্দ নয়, তোমরা নিজেরা তো পেলে পুত্র আর আল্লাহর হিস্সায় কন্যা। এসব তোমাদের মনগড়া। এগুলোর সপক্ষে আল্লাহর কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে নেই। এটি একটি স্রেফ পরস্পর বিরোধী ভাষণ—যা কোনো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান মানুষের মুখ থেকে বের হতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য এ প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। মেনে নিন, শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়ে একথা মুখ দিয়ে বের করিয়েছেন। কিন্তু কুরাইশদের সে সমগ্র জনমণ্ডলী যারা একথা শুনছিল তারা কি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল যে, পরবর্তী বাক্যগুলোয় এই প্রশংসাপূর্ণ শব্দগুলোর সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের বার্তা শুনেও তারা একথাই মনে করতে থাকলো যে, তাদের দেবীদেরকে যথার্থই প্রশংসা করা হয়েছে ? সূরা নজমের শেষ পর্যন্ত যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে সে সমগ্র বক্তব্যই এ একটি মাত্র প্রশংসামূলক বাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেমন করে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে যে , কুরাইশের লোকেরা এগুলো শেষ পর্যন্ত শোনার পর সবাই মিলে একযোগে এ বলে চিৎকার করে বলে থাকবে যে, চলো আজ আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যকার বিরোধ খতম হয়ে গেছে ?

এতো হচ্ছে এ ঘটনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ! এর মাধ্যমে ঘটনাটি যে একেবারেই অর্থহীন ও বাজে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে। এরপর দ্বিতীয় যে জিনিসটি দেখার তা হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে তিনটি আয়াতের নাযিল হওয়ার যে কার্যকারণ বর্ণনা করা হচ্ছে কুরআনের বিন্যাসও তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না ? ঘটনায় বলা হচ্ছে, সূরা নাজমে মিশ্রণ করা হয়েছিল। আর সূরা নাজম ৫ নববী সনে নাযিল হয়। এ মিশ্রণের বিরুদ্ধে সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। আবার একে রহিত ও ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয় সূরা হজ্জের আলোচ্য আয়াতে। এখন অবশ্য দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটিই হয়ে থাকবে। মিশ্রণের ঘটনা যখন ঘটেছে তখনই ক্রোধ প্রকাশ ও রহিত করার আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে অথবা ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াত সূরা বনী ইসরাইলের সাথে এবং রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত সূরা হজ্জের সাথে নাযিল হয়েছে। যদি প্রথম অবস্থাটি হয়ে থাকে। তাহলে বলতে হয় বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। এ আয়াত দু'টি সূরা নাজমে সংযুক্ত করা হলো না বরং ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াতকে ছ'বছর পর্যন্ত এমনিভাবেই রেখে দেয়া হলো এবং সূরা বনী ইসরাঈল যখন নাযিল হলো তখনই তাকে এনে তার সাথে জুড়ে দেয়া হলো। তারপর আবার রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত আরো দু–আড়াই বছর পর্যন্ত পড়ে রইলো এবং সূরা হজ্জ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোথাও সংযুক্ত করা হলো না। কুরআনের বিন্যাস কি এভাবেই হয়েছে, এক সময় যে আয়াতগুলো নাযিল হয় সেগুলো বিক্ষিপ্ত আকারে চারদিকে পড়ে থাকে এবং বছরের পর বছর পার হয়ে যাবার পর তাদের কোনটিকে কোন সূরার সাথে এবং কোন্‌টিকে অন্য সূরার সাথে জুড়ে দেয়া হয় ? কিন্তু যদি দ্বিতীয় অবস্থাটি হয়ে থাকে অর্থাৎ ক্রোধ সংক্রান্ত আয়াত ঘটনার ৬ বছর পর এবং রহিত করা সংক্রান্ত আয়াত আট নয় বছর পর নাযিল হয় তাহলে ইতিপূর্বে আমি যে,

অসামঞ্জস্যের কথা বলে এসেছি তা ছাড়াও এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা হজ্জের মধ্যে এ আয়াতগুলোর নাযিল হওয়ার সুযোগ কোথায় ?

এখানে এসে যথার্থ সমালোচনার তৃতীয় ধারাটি আমাদের সামনে আসে। অর্থাৎ কোনো আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে কুরআনের পূর্বাপর বক্তব্যও তা গ্রহণ করে কি না তা দেখতে হবে। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ রুকূ পড়ে দেখুন। তার পূর্বের ও পরের বক্তব্যের ওপর চোখ বুলিয়ে নিন। এ বক্তব্য পরম্পরায় নবীকে ছ'বছর আগের একটি ঘটনার জন্য শাসিয়ে দেবার সুযোগ কোথায় পাওয়া যায় ? اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ আয়াতে নবীকে কোনো প্রকার শাসানো হচ্ছে কিনা এবং আয়াতের শব্দাবলী কাফেরদের ফিতনায় নবীর জড়িয়ে পড়ার কথা বলছে, না তার প্রতিবাদ করছে—এ প্রশ্ন বাদ দিলেও এভাবে সূরা হজ্জও আপনার সামনে আছে। আলোচ্য আয়াতের পূর্বের বক্তব্যও পড়ুন এবং পরের বক্তব্যও। এ প্রেক্ষাপটে হে নবী ! ৯ বছর পূর্বে কুরআনে মিশ্রণ ঘটাবার যে কাজ তুমি করেছিলে, সে ব্যাপারে ভয় পেয়ো না, ইতিপূর্বেকার নবীদের সাথেও শয়তান এ ব্যবহার করে এসেছে এবং যখনই নবীরা এ ধরনের কাজ করে তখনই আল্লাহ তাকে রহিত করে নিজের আয়াতকে আবার শক্তিশালী ও তরতাজা করে দেন।"—এ ধরনের বক্তব্য কেমন করে এসে গেলো, এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ কি আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

আমি এর আগেও বার বার বলেছি এবং এখানেও আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কোনো রেওয়ায়াত তার বর্ণনা পরম্পরা যতই সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল হোক না কেন তার 'মতন'[১] যখন তার ভুলের দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পেশ করতে থাকে এবং কুরআনের শব্দাবলী, পূর্বাপর বক্তব্য, বিন্যাস, সবকিছুই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে থাকে তখন তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ যুক্তিগুলো একজন সন্দেহবাদী ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানীকে অবশ্য নিশ্চিত করে দেবে। তিনি এ কাহিনীটি পুরোপুরি মিথ্যা বলে মেনে নেবেন। আর কোনো মু'মিন তো একে কখনো সত্য বলে মেনে নিতে পারেন না। কারণ তিনি প্রকাশ্য দেখছেন এ রেওয়ায়াতটি কুরআনের একটি নয় বহু আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। একজন মুসলমানের পক্ষে একথা মেনে নেয়া বড়ই সহজ যে, এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছে। এর তুলনায় তারা কখনো একথা মেনে নিতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজেই নিজের মানসিক আকাংখার তাড়নায় কুরআনে একটি শব্দও মেশাতে পারতেন অথবা তাঁর মনে কখনো মুহূর্তকালের জন্যও এ চিন্তা আসতে পারতো যে, তাওহীদের সাথে শিরকের কিছুটা মিশ্রণ ঘটিয়ে কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট করা হোক কিংবা আল্লাহর ফরমানসমূহের ব্যাপারে তিনি কখনো এ আকাংখা পোষণ করতে পারতেন যে, আল্লাহ যেন এমন কোনো কথা বলে না বসেন যার ফলে কাফেররা নারাজ হয়ে যায় অথবা তাঁর কাছে এমন কোনো অসংরক্ষিত ও সংশয়পূর্ণ পদ্ধতিতে অহী আসতো যার ফলে জিব্রীলের সাথে সাথে শয়তানও তাঁর কাছে নিজের কোনো শব্দ প্রক্ষেপ করতো এবং তিনি তাকেও জিব্রীলের নিয়ে আসা শব্দ মনে করার ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকতেন। এর মধ্যে প্রত্যেকটি কথাই কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য বিরোধী। আমাদের মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যেসব আকীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত আছে এগুলো তারও বিরোধী। এমন

১. বর্ণনা পরম্পরা বাদ দিয়ে হাদীসের মূল ভাষ্য।—অনুবাদক

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

অস্বীকারকারীরা তো তার পক্ষ থেকে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে যতক্ষণ না তাদের ওপর কিয়ামত এসে পড়বে অকস্মাত অথবা নাযিল হয়ে যাবে একটি ভাগ্যাহত[১০২] দিনের শাস্তি। সেদিন বাদশাহী হবে আল্লাহর এবং তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হবে তারা যাবে নিয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে আর যারা কুফরী করে থাকবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে থাকবে তাদের জন্য হবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

ধরনের রেওয়ায়াতের পেছনে দৌড়ানো থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, নিছক সনদের সংযোগ রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা কিংবা বর্ণনাসূত্রের আধিক্য দেখে কোনো মুসলমানকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে এমন কঠিন কথাও স্বীকার করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

এত বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করার সাথে জড়িত থাকতে দেখে মনে যে সন্দেহ জাগে এ প্রসংগে তা দূর করে দেয়া সংগত মনে করি। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে, যদি এ ঘটনাটির মূলে কোনো সত্য না-ই থাকে তাহলে নবী ও কুরআনের বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ হাদীসের এত বিপুল সংখ্যক রাবীদের মাধ্যমে যাদের মধ্যে বড় বড় খ্যাতিমান নির্ভরযোগ্য বুযর্গও রয়েছেন, কেমন করে বিস্তার লাভ করলো ? এর জবাব হচ্ছে, হাদীসের বিপুল সম্পদের মধ্যেই আমরা এর কারণ খুঁজে পাই। বুখারী, মুসলিম, আবুদ দাউদ, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদে আসল ঘটনাটি এভাবে এসেছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজম তেলাওয়াত করেন। সূরা শেষে যখন তিনি সিজদা করেন তখন মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে সকল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সিজদা করে। আসল ঘটনা শুধু এতটুকুই ছিল। আর এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। প্রথমত কুরআনের শক্তিশালী বক্তব্য এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী বর্ণনা ভংগী, এর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠে এর যাদুকরী প্রকাশের পর যদি তা শুনে উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ জিনিসটির জন্যই তো কুরাইশরা বলতো, এ ব্যক্তি যাদুকর।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

৮ রুকূ'

আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে ভালো জীবিকা দেবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহই সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা। তিনি তাদেরকে এমন জায়গায় পৌছিয়ে দেবেন যা তাদেরকে খুশী করে দেবে, নিসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন ও পরম ধৈর্যশীল।[১০৩] এতো হচ্ছে তাদের অবস্থা, আর যেঁ ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয় ঠিক যেমন তার সাথে করা হয়েছে তেমনি এবং তারপর তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন,[১০৪] আল্লাহ গোনাহমাফকারী ও ক্ষমাশীল।[১০৫]

তবে মনে হয়, পরে কুরাইশরা নিজেদের এ সাময়িক ভাবাবেগের জন্য কিছুটা লজ্জিত হয়ে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি অথবা কিছু লোক নিজেদের এ কাজের এ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকবে যে, জনাব আমরা তো মুহাম্মাদের মুখ থেকে নিজেদের মাবুদদের প্রশংসায় কিছু কথা শুনেছিলাম, যে কারণে আমরা তার সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলাম। অন্যদিকে এ ঘটনাটি হাবশার মুহাজিরদের কাছে এভাবে পৌছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। কারণ লোকেরা তাঁকে এবং মুশরিক ও মু'মিনদেরকে একসাথে সিজদা করতে দেখেছিল। এ গুজব এতো বেশী ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রায় ৩৩ জন মুহাজির মক্কায় ফিরে আসেন। এক শতাব্দীর মধ্যে এ তিনটি কথা অর্থাৎ কুরাইশদের সিজদা, এ সিজদার এ ব্যাখ্যা এবং হাবশার মুহাজিরদের ফিরে আসা একসাথে মিশে একটি কাহিনীর আকার ধারণ করে এবং অনেক মুত্তাকী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য লোকও এ ঘটনা বর্ণনা করতে থাকেন। মানুষ যাই হোক না কেন মূলত মানুষই। বড় বড় সৎকর্মপরায়ণ ও জ্ঞানবান লোকেরাও অনেক সময় ভুল ভ্রান্তি করে বসেন এবং তাদের এ ভুল সাধারণ লোকের ভুলের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। এদের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণকারীরা এদের সঠিক কথার সাথে সাথে ভুল কথাগুলোও চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নেয়। আর মন্দ চরিত্রের লোকেরা এদের ভুলগুলো বাছাই করে করে একত্র করে এবং এগুলোকে প্রমাণ হিসেবে

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

এসব[১০৬] এজন্য যে, আল্লাহই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে[১০৭] এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[১০৮] এসব এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা।[১০৯] আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও মহান। তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে জমি সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে?[১১০] আসলে তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।[১১১] যাকিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে সব তাঁরই। নিসন্দেহে তিনিই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।[১১২]

পেশ করে বলতে থাকে, এদের মাধ্যমে আমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছেছে সবই আগুনে পুড়িয়ে ফেলার যোগ্য।

১০২. মূলে আছে عَقِيْمٌ শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "বন্ধ্যা" দিনকে বন্ধ্যা বলার দুটি অর্থ হতে পারে। এক, এমন ভাগ্য বিড়ম্বিত দিন যার মধ্যে কোনো রকম কলাকৌশল কার্যকর হয় না। প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রত্যেকটা আশা নিরাশায় পরিণত হয়। দুই, এমন দিন যার পরে রাত দেখা আর ভাগ্যে জোটে না। উভয় অবস্থায়ই এর অর্থ হচ্ছে, এমন দিন যেদিন কোনো জাতির ধ্বংসের ফায়সালা হয়ে যায়। যেমন যেদিন নূহের জাতির ওপর তুফান এলো সেদিনটি তাদের জন্য ছিল 'বন্ধ্যা' দিন। এমনিভাবে আদ, সামূদ, লূতের জাতি, মাদয়ানবাসী ও অন্যান্য সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির জন্য আল্লাহর আযাব নাযিলের দিনটি বন্ধ্যা দিনই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ "সেদিনের" পরে আর তার "পরের দিন" দেখা যায়নি এবং নিজেদের বিপর্যস্ত ভাগ্যকে সৌভাগ্যে রূপান্তরিত করার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১০৩. মূল শব্দ হচ্ছে عَلِيْمٌ অর্থাৎ তিনি জানেন কে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পথে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছে এবং সে কোন ধরনের পুরস্কার লাভের যোগ্য। মূলে আরো বলা

হয়েছে حَلِيْمٌ অর্থাৎ এ ধরনের ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে তাদের বড় বড় কর্মকাণ্ড ও ত্যাগকে তিনি বিনষ্ট করে দেবেন না। তিনি সেগুলো উপেক্ষা করবেন এবং তাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন।

১০৪. প্রথমে এমন মজলুমদের কথা বলা হয়েছিল যারা জুলুমের জবাবে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। আর এখানে এমন মজলুমদের কথা বলা হচ্ছে যারা জুলুমের জবাবে শক্তি ব্যবহার করে।

ইমাম শাফেঈ এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, জুলুমের কিসাস সেভাবেই নেয়া হবে যেভাবে জুলুম করেছে। যেমন কোনো ব্যক্তি একজনকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে এ অবস্থায় তাকেও পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। আবার কোনো ব্যক্তি একজনকে পুড়িয়ে মেরেছে জবাবে তাকেও পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু হানাফীয়াদের মতে হত্যাকারী যেভাবেই হত্যা করুক না কেন তার থেকে একই পরিচিত পদ্ধতিতেই কিসাস গ্রহণ করা হবে।

১০৫. এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত দুটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, জুলুমের জবাবে যে রক্তপাত করা হবে আল্লাহর কাছে তা ক্ষমাযোগ্য, যদিও রক্তপাত মূলত ভালো জিনিস নয়। দুই, তোমরা যে আল্লাহর বান্দা তিনি ভুল ত্রুটি মার্জনা করেন ও গোনাহ মাফ করে দেন। তাই তোমাদেরও সামর্থ অনুযায়ী মানুষের ভুলত্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা উচিত। মুমিনরা ক্ষমাশীল, উদার হৃদয় ও ধৈর্যশীল, এগুলো তাদের চরিত্রের ভূষণ। প্রতিশোধ নেবার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। কিন্তু নিছক প্রতিশোধ স্পৃহা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা লালন করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়।

১০৬. এ প্যারাটি সম্পর্কে শুধুমাত্র নিকটবর্তী শেষ বাক্যটির সাথে নয় বরং উপরের পুরো প্যারাটির সাথে রয়েছে। অর্থাৎ কুফরী ও জুলুমের পথ অবলম্বনকারীদের ওপর আযাব নাযিল করা, মুমিন সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পুরস্কার দেয়া, সত্যপন্থী, মজলুমদের ফরিয়াদ শোনা এবং শক্তি প্রয়োগ করে জুলুমের মোকাবিলাকারী সত্যপন্থীদের সাহায্য করা, এসবের কারণ কি ? এসবের কারণ হচ্ছে আল্লাহর এই গুণাবলী।

১০৭. অর্থাৎ তিনিই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার শাসনকর্তা এবং দিন রাত্রির আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। এই বাহ্যিক অর্থের সাথে সাথে এ বাক্যের মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, রাতের অন্ধকার থেকে যে আল্লাহ দিনের আলো বের করে আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের ওপর যিনি রাতের অন্ধকার জড়িয়ে দেন তাঁরই এমন ক্ষমতা আছে। যার ফলে আজ যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সূর্য মধ্যগগনে কিরণ দিচ্ছে তাদের পতন ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দ্রুত দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের যে অন্ধকার আজ সত্য ও ন্যায়ের প্রভাতের উদয়ের পথ রোধ করে আছে তা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর হুকুমে সরে যাবে এবং এ সংগে সেদিনের উদয় হবে যেদিন সত্য, সততা ও জ্ঞানের আলোকে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠবে।

১০৮. অর্থাৎ তিনি অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন বরং এমন আল্লাহ যিনি দেখতে ও শুনতে পান।

১০৯. অর্থাৎ তিনিই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ও যথার্থ রব। তাঁর বন্দেগীকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে না। আর অন্যান্য সকল মাবুদই আসলে পুরোপুরি অসত্য ও অর্থহীন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

৯ রুকূ'

তুমি কি দেখো না, তিনি পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য অনুগত করে রেখেছেন এবং তিনিই নৌযানকে নিয়মের অধীন করেছেন যার ফলে তাঁর হুকুমে তা সমুদ্রে বিচরণ করে আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন যার ফলে তাঁর হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর ওপর পতিত হতে পারে না।[১১৩] আসলে আল্লাহ লোকদের জন্য বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান। তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই আবার তোমাদের জীবিত করবেন ; সত্য বলতে কি, মানুষ বড়ই সত্য অস্বীকারকারী।[১১৪]

তাদেরকে যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে সেগুলোর মূলত কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভরসায় যারা বেঁচে থাকে তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।

১১০. এখানে আবার প্রকাশ্য অর্থের পেছনে একটি সূক্ষ্য ইশারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রকাশ্য অর্থ তো হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা বর্ণনা করা। কিন্তু এর মধ্যে এ সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তার ছিটেফোঁটা পড়ার সাথে সাথেই যেমন তোমরা দেখো বিশুষ্ক ভূমি অকস্মাৎ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আজ যে অহীর শান্তিধারা বর্ষিত হচ্ছে তা শিগগির তোমাদের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখাবে। তোমরা দেখবে আরবের অনুর্বর বিশুষ্ক মরুভূমি জ্ঞান, নৈতিকতা ও সুসংস্কৃতির গুলবাগীচায় পরিণত হয়ে গেছে।

১১১. মূলে لَطِيْفٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, অনুভূত পদ্ধতিতে নিজের ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণকারী। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে লোকেরা তার সূচনায় কখনো তার পরিণামের কল্পনাও করতে পারে না। লাখো লাখো শিশু দুনিয়ায় জন্মলাভ করে। কে জানতে পারে, তাদের মধ্যে কে হবে ইবরাহীম যিনি নেতা হবে দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষের ? আর কে হবে চেংগীজ, যে বিধ্বস্ত করে দেবে এশিয়া ও ইউরোপ ভূখণ্ডকে ? দূরবীন যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখন কে ধারণা করতে পেরেছিলে যে, এর ফলে এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত মানুষ পৌঁছে যাবে ? কলম্বাস যখন সফরে বের হচ্ছিল তখন কে জানতো এর মাধ্যমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

প্রত্যেক[১১৫] উম্মতের জন্য আমি একটি ইবাদাতের পদ্ধতি[১১৬] নির্দিষ্ট করেছি, যা তারা অনুসরণ করে ; কাজেই হে মুহাম্মাদ! এ ব্যাপারে তারা যেন তোমার সাথে ঝগড়া না করে।[১১৭] তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও। অবশ্যই তুমি সঠিক সরল পথে আছো।[১১৮] আর যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে তাহলে বলে দাও, "যাকিছু তোমরা করছো আল্লাহ তা খুব ভালোই জানেন। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছো আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেসব বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন।" তুমি কি জানো না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন ? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়।[১১৯]

ভিত গড়া হচ্ছে ? মোটকথা আল্লাহর পরিকল্পনা এমন সূক্ষ্মতর ও অজ্ঞাত পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয় যে, যতক্ষণ তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে না যায় ততক্ষণ কিসের জন্য কাজ চলছে তা কেউ জানতেও পারে না।

মূলে আরো বলা হয়েছে خَبِيْرٌ অর্থাৎ তিনি নিজের দুনিয়ার অবস্থা, প্রয়োজন ও উপকরণাদি সম্পর্কে অবগত। নিজের প্রভুত্বের কাজ কিভাবে করতে হয় তিনি জানেন।

১১২. তিনি "অমুখাপেক্ষী" অর্থাৎ একমাত্র তাঁর সত্তাই কারো মুখাপেক্ষী নয়। আর তিনিই "প্রশংসার্হ" অর্থাৎ প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র তাঁরই জন্য এবং কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক নিজের সত্তার মধ্যে তিনি নিজেই প্রশংসিত।

১১৩. আকাশ বলতে এখানে সমগ্র ঊর্ধজগতকে বুঝানো হয়েছে, যার প্রত্যেকটি জিনিস নিজ নিজ জায়গায় আটকে আছে।

১১৪. অর্থাৎ এসব কিছু দেখেও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যে সত্য পেশ করেছেন তা অস্বীকার করে যেতে থাকে।

১১৫. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মত।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করে যাদের জন্য না তিনি কোনো প্রমাণ পত্র অবতীর্ণ করেছেন আর না তারা নিজেরাই তাদের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান রাখে।[১২০] এ যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।[১২১] আর যখন তাদেরকে আমার পরিষ্কার আয়াত শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তোমরা দেখো সত্য অস্বীকারকারীদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে এবং মনে হতে থাকে এ-ই বুঝি যারা তাদেরকে আমার আয়াত শুনায় তাদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদেরকে বলো, "আমি কি তোমাদের বলবো, এর চেয়ে খারাপ জিনিস কি?[১২২] আগুন। আল্লাহ এরই প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য দিয়ে রেখেছেন, যারা সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তা বড়ই খারাপ আবাস।"

১১৬. এখানে 'মানসাক' শব্দটি কুরবানী অর্থে নয় বরং সমগ্র ইবাদাত ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আগে এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছিল "কুরবানীর নিয়ম" কারণ সেখানে "যাতে লোকেরা ঐ পশুগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন" এ পরবর্তী বাক্যটি তার ব্যাপক অর্থের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কুরবানীকেই চিহ্নিত করছিল। কিন্তু এখানে একে নিছক "কুরবানী" অর্থে গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং ইবাদাতকে যদি পূজা অর্চনার পরিবর্তে "বন্দেগীর" ব্যাপকতার অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা মূল উদ্দেশ্যের বেশী নিকটবর্তী হবে। এভাবে শরীয়াত ও মিনহাজের যে অর্থ হয় মান্‌সাকেরও (বন্দেগীর পদ্ধতি) সে একই অর্থ হবে। এটি সূরা মায়েদার বিষয়বস্তুর পুনরাবর্তন হবে, যেখানে বলা হয়েছে—

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করেছি।" (৪৮ আয়াত)

১১৭. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন নিজের যুগের উম্মতের জন্য একটি পদ্ধতি (মানসাক) এনেছিলেন তেমনি এ যুগের উম্মতের জন্যে তুমি একটি পদ্ধতি এনেছো। এখন এ ব্যাপারে তোমার পথে কারোর ঝগড়া করার অধিকার নেই। কারণ এ যুগের জন্য এ পদ্ধতিই সত্য। সূরা জাসীয়ায় এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

"তারপর (বনী ইসরাঈলের নবীদের পরে) হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে দীনের ব্যাপারে একটি শরীয়াতের (পদ্ধতি) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই তার অনুসরণ করো এবং যারা জ্ঞান রাখে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"(১৮ আয়াত)

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শুরা ২০ টীকা)

১১৮. পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে এ মাত্র আমি যে অর্থ বর্ণনা করে এসেছি এ বাক্যটি সে অর্থই পুরোপুরি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে।

১১৯. বর্ণনা পরম্পরার সাথে এ প্যারার সম্পর্ক বুঝতে হলে এ সূরার ৫৫ থেকে ৫৭ আয়াত পর্যন্ত দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে।

১২০. অর্থাৎ আল্লাহর কোনো কিতাবে বলা হয়নি, "আমি অমুক অমুককে আমার সাথে প্রভুত্বের কর্তৃত্বে শরীক করেছি। কাজেই আমার সাথে তোমরা তাদেরকেও ইবাদাতে শরীক করো।" আর কোনো জ্ঞান মাধ্যমেও তারা একথা জানেনি যে, এরা অবশ্যই প্রভুত্বের কর্তৃত্বে অংশীদার এবং এজন্য এরা ইবাদাত লাভের হকদার। এখন এ যেসব বিভিন্ন ধরনের উপাস্য তৈরি করে এদের গুণাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আকীদা তৈরি করে নেয়া হয়েছে এবং এদের আস্তানায় কপাল ঠেকানো হচ্ছে, প্রয়োজন পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, এদের বেদীতে ভেট ও নযরানা চড়ানো হচ্ছে, আস্তানা প্রদক্ষিণ করা হচ্ছে এবং সেখানে উপাসনার জন্য নির্জনবাস করা হচ্ছে—এসব কিছু জাহেলী ধারণার অনুসরণ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

১২১. অর্থাৎ এ নির্বোধরা মনে করছে, এ উপাস্যরা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাহায্যকারী হবে। অথচ আসলে তাদের কোনোই সাহায্যকারী নেই, এ উপস্যরাতো নয়ই। কারণ তাদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা নেই। আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী নন। কারণ তারা তো তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিজেদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে।

১২২. অর্থাৎ আল্লাহর কালাম শুনে তোমাদের মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে তার চেয়ে মারাত্মক জিনিস অথবা তাঁর আয়াত যারা শুনায় তাদের সাথে যে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার তোমরা করতে পারো তার চেয়েও খারাপ জিনিসের মুখোমুখি তোমাদের হতে হবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٤﴾ اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٦﴾

১০ রুকূ'

হে লোকেরা! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে তোমরা ডাকো তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারবে না। বরং যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও দুর্বল।[১২৩] *তারা আল্লাহর কদরই বুঝলো না যেমন তা বুঝা উচিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই শক্তিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন।*

আসলে আল্লাহ (নিজের ফরমান পাঠাবার জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও।[১২৪] *তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যাকিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে তাও তিনি জানেন*[১২৫] *এবং যাবতীয় বিষয় তাঁরই দিকে ফিরে আসে।*[১২৬]

১২৩. অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী তো দুর্বল হবার কারণেই তার চাইতে উচ্চতর কোনো শক্তির কাছে সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সে যাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে তাদের দুর্বলতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা একটি মাছির কাছেও হার মানে। এখন তাদের দুর্বলতার অবস্থা চিন্তা করো যারা নিজেরাও দুর্বল এবং যাদের ওপর নির্ভর করে তাদের আশা-আকাংখা-কামনা-বাসনাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারাও দুর্বল।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ وَجَـٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

হে ঈমানদারগণ! রুকূ' ও সিজদা করো, নিজের রবের বন্দেগী করো এবং নেক কাজ করো, হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে।১২৭ আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করলে তার হক আদায় হয়।১২৮ তিনি নিজের কাজের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন১২৯ এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।১৩০ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও।১৩১ আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন "মুসলিম" এবং এর (কুরআন) মধ্যেও (তোমাদের নাম এটিই)১৩২ যাতে রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও লোকদের ওপর।১৩৩ কাজেই নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও।১৩৪ তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।

১২৪. এর অর্থ হচ্ছে, মুশরিকরা সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে যেসব সত্তাকে উপাস্যে পরিণত করেছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হচ্ছে ফেরেশতা বা নবী। তারা শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান পৌছে দেবার মাধ্যম। এর বেশী তাদের অন্য কোনো মর্যাদা নেই। আল্লাহ তাদেরকে শুধুমাত্র এ কাজের জন্যই বাছাই করে নিয়েছেন। নিছক এতটুকুন মর্যাদা তাদেরকে প্রভু বা প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শরীকে পরিণত করে না।

১২৫. কুরআন মাজীদে এ বাক্যটি সাধারণত শাফায়াতের মুশরিকী ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়ে থাকে। কাজেই এ স্থানে একে পেছনের বাক্যের পরে বলার এ অর্থ দাঁড়ায়

যে, ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদেরকে অভাবপূরণকারী ও কার্য উদ্ধারকারী মনে না করেও যদি আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী মনে করেও তোমরা পূজা-অর্চনা করো তাহলে তাও ঠিক নয়। কারণ একমাত্র আল্লাহই সবকিছু দেখেন ও শোনেন। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা একমাত্র তিনিই জানেন। দুনিয়ার প্রকাশ্য ও গোপন কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়াবলী একমাত্র তিনিই জানেন। ফেরেশতা ও নবীসহ কোনো সৃষ্টিও ঠিকভাবে জানেনা কোন্ সময় কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী সৃষ্টিকেও এ অধিকার দেননি যে, সে তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সুপারিশ করে বসবে এবং তার সুপারিশ গৃহিত হয়ে যাবে।

১২৬. অর্থাৎ বিষয়াবলীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণরূপে তাঁর ক্ষমতাধীন। বিশ্ব-জাহানের ছোট বড় কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক অন্য কেউ নয়। কাজেই নিজের আবেদন নিবেদন নিয়ে অন্য কারো কাছে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যেকটি বিষয় ফায়সালার জন্য আল্লাহর সামনেই উপস্থাপিত হয়। কাজেই কোনো কিছুর জন্য আবেদন করতে হলে তাঁর কাছেই করো। যেসব সত্তা নিজেদেরই অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে না তাদের মতো ক্ষমতাহীনদের কাছে কি চাও ?

১২৭. অর্থাৎ এ নীতি অবলম্বন করলে সফলতার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ নীতি অবলম্বন করবে তার নিজের কার্যক্রমের ব্যাপারে এমন অহংকার থাকা উচিত নয় যে, সে যখন এত বেশী ইবাদাতগুজার ও নেক্‌কার তখন সে নিশ্চয়ই সফলকাম হবে। বরং তার আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থী হওয়া এবং তাঁরই রহমতের সাথে সমস্ত আশা আকাংখা বিজড়িত করা উচিত। তিনি সফলতা দান করলেই কোনো ব্যক্তি সফলতা পেতে পারে। নিজে নিজেই সফলতা লাভ করার সামর্থ কারো নেই।

"হয়তো তোমাদের ভাগ্যে সফলতা আসবে"—এ বাক্যটি বলার অর্থ এ নয় যে, এ ধরনের সফলতা লাভ করার বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। বরং এটি একটি রাজকীয় বর্ণনা পদ্ধতি। বাদশাহ যদি তাঁর কোনো কর্মচারীকে বলেন, অমুক কাজটি করো, হয়তো তুমি অমুক পদটি পেয়ে যাবে, তখন কর্মচারীর গৃহে খুশীর বাদ্য বাজতে থাকে। কারণ এর মধ্যে রয়েছে আসলে একটি প্রতিশ্রুতির ইংগিত। কোনো সদাশয় প্রভুর কাছ থেকে কখনো এটি আশা করা যেতে পারে না যে, কোনো কাজের পুরস্কার স্বরূপ কাউকে তিনি নিজেই কিছু দান করার আশা দেবেন এবং তারপর নিজের বিশ্বস্ত সেবককে হতাশ করবেন।

ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ—এর মতে সূরা হজ্জের এ আয়াতটিও সিজদার আয়াত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নাখ্‌ঈ ও সুফিয়ান সওরী এ জায়গায় তেলাওয়াতের সিজদার প্রবক্তা নন। উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণ আমি এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

প্রথম দলটির প্রথম যুক্তিটির ভিত্তি হচ্ছে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। যাতে সিজদার হুকুম দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে উকবাহ ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াত। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী এটি উদ্ধৃত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ عَلٰى سَائِرِ الْقُرْاٰنِ بِسَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ نَعَمْ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! সূরা হজ্জ কি সমগ্র কুরআনের ওপর এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে যে, তার মধ্যে দু'টি সিজদা আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ ; কাজেই যে সেখানে সিজদা করবে না সে যেন তা না পড়ে।"

তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে, আবু দাউদ ও ইবনে মাজার হাদীস, যাতে আমর ইবনুল আস (রা) বলছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সূরা হজ্জের দু'টি সিজদা শিখিয়েছিলেন। চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে, হযরত উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), ইবনে উমর (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আবুদ দারদা (রা), আবু মূসা আশআরী (রা) ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা আছে।

দ্বিতীয় দলের যুক্তি হচ্ছে আয়াতে নিছক সিজদার হুকুম নেই বরং একসাথে রুকূ' ও সিজদা করার হুকুম আছে আর কুরআনে যখনই রুকূ' ও সিজদা মিলিয়ে বলা হয়, তখনই এর অর্থ হয় নামায। তাছাড়া রুকূ' ও সিজদার সম্মিলিত রূপ একমাত্র নামাযের মধ্যেই পাওয়া যায়। উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াত সম্পর্কে তারা বলেন, এর সনদ দুর্বল। একে ইবনে লাহীআহ বর্ণনা করেছেন আবুল মাস'আব বাসরী থেকে এবং এরা দু'জনই যঈফ তথা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। বিশেষ করে আবু মাস'আব তো এমন এক ব্যক্তি যিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে কাবা ঘরের ওপর পাথর বর্ষণ করেছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিকেও তাঁরা নির্ভরযোগ্য নয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ এটি সাঈদুল আতীক রেওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুনাইন আল কিলাবী থেকে। এরা দু'জনই অপরিচিত। কেউ জানে না এরা কারা এবং কোন্ পর্যায়ের লোক ছিল। সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে তারা বলেন, ইবনে আব্বাস সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা হবার এই পরিষ্কার অর্থ বলেছেন যে, الاولى عزمة والاخرة تعليم অর্থাৎ প্রথম সিজদা অপরিহার্য এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষামূলক।

১২৮. জিহাদ মানে নিছক রক্তপাত বা যুদ্ধ নয় বরং এ শব্দটি প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব এবং চূড়ান্ত চেষ্টা চালানো অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার জিহাদ ও মুজাহিদের মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, বাধা দেবার মতো কিছু শক্তি আছে যেগুলোর মোকাবিলায় এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম কাম্য। এই সংগে "ফিল্লাহ" (আল্লাহর পথে) শব্দ এ বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয় যে, বাধাদানকারী শক্তিগুলো হচ্ছে এমনসব শক্তি যেগুলো আল্লাহর বন্দেগী, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উদ্দেশ্য হয় তাদের বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করে মানুষ নিজেও আল্লাহর যথাযথ বন্দেগী করবে এবং দুনিয়াতেও তাঁর কালেমাকে বুলন্দ এবং কুফর ও নাস্তিক্যবাদের কালেমাকে নিম্নগামী করার জন্য প্রাণপাত করবে। মানুষের নিজের "নফসে আম্মারা" তথা বৈষয়িক ভোগলিপ্সু ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে এ মুজাহাদা ও প্রচেষ্টার প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। এ নফসে আম্মারা সবসময় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে

থাকে এবং মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চালায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত ও বিজিত না করা পর্যন্ত বাইরে কোনো প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। তাই এক যুদ্ধ ফেরত গাজীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

"তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসে গেছো।"

আরো বলেন, مجاهدة العبد هواه "মানুষের নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম।" এরপর সারা দুনিয়াই হচ্ছে জিহাদের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। সেখানে কর্মরত সকল প্রকার বিদ্রোহাত্মক, বিদ্রোহোদ্দীপক ও বিদ্রোহোৎপাদক শক্তির বিরুদ্ধে মন, মস্তিষ্ক, শরীর ও সম্পদের সমগ্র শক্তি সহকারে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে জিহাদের হক আদায় করা, যার দাবী এখানে করা হচ্ছে।

১২৯. অর্থাৎ উপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (১৪৩ আয়াত) এবং সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (১১০ আয়াত) এখানে একথাটিও জানিয়ে দেয়া সংগত মনে করি যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তরভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্য লোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাঁদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

১৩০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের ফকীহ, ফরিশী ও পাদরীরা তাদের ওপর যেসব অপ্রয়োজনীয় ও অযথা নীতি-নিয়ম চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলো থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এখানে চিন্তা-গবেষণার ওপর এমন কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি যা তাত্ত্বিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার বাস্তব কর্মজীবনেও এমন বিধি নিষেধের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়নি যা সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে একটি সহজ সরল বিশ্বাস ও আইন। এ নিয়ে তোমরা যতদূর এগিয়ে যেতে চাও এগিয়ে যেতে পারো। এখানে যে বিষয়বস্তুটিকে ইতিবাচক ভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি আবার অন্যত্র উপস্থাপিত হয়েছে নেতিবাচক ভংগীতে। যেমন—

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"এ রসূল তাদেরকে পরিচিত সৎকাজের হুকুম দেয় এবং এমন সব অসৎ কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন যেগুলো করতে মানবিক প্রকৃতি অস্বীকার করে আর এমন

সব জিনিস তাদের জন্য হালাল করে যেগুলো পাক পবিত্র এবং এমন সব জিনিস হারাম করে যেগুলো নাপাক ও অপবিত্র। আর তাদের ওপর থেকে এমন ভারী বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং এমন সব শৃংখল থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যেগুলোয় তারা আটকে ছিল।" (আ'রাফ ঃ ১৫৭)

১৩১. যদিও ইসলামকে ইবরাহীমের মিল্লাতের ন্যায় নূহের মিল্লাত, মূসার মিল্লাত ও ঈসার মিল্লাত বলা যেতে পারে কিন্তু কুরআন মজীদে বার বার একে ইবরাহীমের মিল্লাত বলে তিনটি কারণে এর অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এক, কুরআনের বক্তব্যের প্রথম লক্ষ ছিল আরবরা, আর তারা ইবরাহীমের সাথে যেভাবে পরিচিত ছিল তেমনটি আর কারো সাথে ছিল না। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আকীদা-বিশ্বাসে যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। দুই, হযরত ইবরাহীমই এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে ইহুদী, খৃস্টান, মুসলমান, আরবীয় মুশরিক ও মধ্যপ্রাচ্যের সাবেয়ী তথা নক্ষত্র পূজারীরা সবাই একমত ছিল। নবীদের মধ্যে দ্বিতীয় এমন কেউ ছিলেন না এবং নেই যার ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারে। তিন, হযরত ইবরাহীম এসব মিল্লাতের জন্মের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন। ইহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও সাবেয়ীবাদ সম্পর্কে তো সবাই জানে যে, এগুলো পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছে আর আরবীয় মুশরিকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা নিজেরাও একথা স্বীকার করতো যে, তাদের সমাজে মূর্তিপূজা শুরু হয় আমর ইবনে লুহাই থেকে। সে ছিল বনী কুযা'আর সরদার। মা'আব (মাওয়াব) এলাকা থেকে সে 'হুবুল' নামক মূর্তি নিয়ে এসেছিল। তার সময়টা ছিল বড় জোর ঈসা আলাইহিস সালামের পাঁচ-ছ-শ বছর আগের। কাজেই এ মিল্লাতটিও হযরত ইবরাহীমের শত শত বছর পরে তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় কুরআন যখন বলে এ মিল্লাতগুলোর পরিবর্তে ইবরাহীমের মিল্লাত গ্রহণ করো তখন সে আসলে এ সত্যটি জানিয়ে দেয় যে, যদি হযরত ইবরাহীম সত্য ও হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকেন এবং মিল্লাতগুলোর মধ্য থেকে কোনটিরই অনুসারী না থেকে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাঁর মিল্লাতেই প্রকৃত সত্য মিল্লাত। পরবর্তীকালের মিল্লাতগুলো সত্য নয়। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মিল্লাতের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, ১৩৪-১৩৫, সূরা আলে ইমরান, ৫৮, ৭৯ এবং সূরা আন নহল, ১২০ টীকা।

১৩২. "তোমাদের সম্বোধনটি শুধুমাত্র এ আয়াতটি নাযিল হবার সময় যেসব লোক ঈমান এনেছিল অথবা তারপর ঈমানদারদের দলভুক্ত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়নি বরং মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই যারা তাওহীদ, আখেরাত, রিসালাত ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দলভুক্ত থেকেছে তাদের সবাইকেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, এ সত্য মিল্লাতের অনুসারীদেরকে কোনোদিন "নূহী" "ইবরাহিমী", 'মূসাভী" বা "মসীহী" ইত্যাদি বলা হয়নি বরং তাদের নাম "মুসলিম" (আল্লাহর ফরমানের অনুগত) ছিল এবং আজো তারা "মুহাম্মাদী" নয় বরং মুসলিম। একথাটি না বুঝার কারণে লোকদের জন্য এ প্রশ্নটি একটি ধাঁধার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন্ কিতাবে মুসলিম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল ?

১৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ১৪৪ টীকা। এর চাইতেও বিস্তারিত আকারে এ বিষয়টি আমার "সত্যের সাক্ষ" বইতে আলোচনা করেছি।

১৩৪. অথবা অন্য কথায় মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। সাহায্যের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার ওপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো।